গোপাল হালদার
অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য রূপে অনুমোদিত।
Recommended as a Text-Book of Bengali Reader for Class VII (vide T. B. No. 76/7/T.B./71 dated 24-12-76)

বাংলা পাঠ

প্রথম ভাগ

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

গোপাল হালদার
অনিলকুমার কাঞ্জিলাল
কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

প্রকাশ ভবন
কলকাতা-৭৩

'প্রকাশ ভবন'-এর পক্ষে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত।

'তাপসী প্রিন্টার্স'-এর পক্ষে লীলা ঘোষ কর্তৃক
৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪
পরিবর্তিত সংস্করণ ১৯৭৬
পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭
পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৮০
পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৮৩
পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৮৫

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

নিবেদন

'বাংলা পাঠ', প্রথম ভাগ, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক ইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বাংলা সাহিত্যের পাঠক্রম অনুসারে সংগ্রথিত হইল। সাহিত্য-পাঠে ছাত্রছাত্রীদের ভাষা-শিক্ষাই প্রথম উদ্দেশ্য, কিন্তু সেইসঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি ও সাহিত্যবোধ জাগ্রত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। ভাষার বুনিয়াদ পাকা না হইলে, সাহিত্য-রচনার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আবার, যাহাতে পাঠকের মনে কৌতুহল ও আনন্দের সঞ্চার না হয়, সে রচনাও যথার্থ সাহিত্য হয় না। গদ্যে ও পদ্যে বাংলা ভাষায় এরূপ সার্থক রচনার নিদর্শনের অভাব নাই। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের বয়স ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মনে রাখিয়া, নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যার স্বল্প পরিসরের মধ্যে ঐরূপ রচনার কিছু নিদর্শন সংগ্রথিত করা সহজসাধ্য নহে। আমরা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বাংলা ভাষার বুনিয়াদ স্থিরভাবে বুঝিবার এবং তৎসঙ্গে নানা বিষয়ে জ্ঞান ও আনন্দ লাভের সহায়ক সার্থক গদ্য-পদ্য রচনার কিছু নিদর্শন এই বাংলা সাহিত্য-পাঠে সংকলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীগণ উভয়ের নিকট এই সংকলনখানি সমাদর লাভ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইতি ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ॥

গোপাল হালদার
আনলকুমার কাঞ্জিলাল

পরিবর্তিত সংস্করণে বইখানি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য রূপে অনুমোদিত হইয়াছে। বর্তমান পুনর্মুদ্রণে কোথাও কোথাও অনুশীলনীতে দুই-একটা নূতন প্রশ্ন যোগ করা হইয়াছে। ইহার প্রচ্ছদচিত্র আঁকিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ইতি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ ॥

গোপাল হালদার
অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

গদ্য-রচনা

কবিতা

কাজের লোক কে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ প্রায় চার-শো বৎসর হইল পাঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন সে কোথায় বাপের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে—আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে—সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই

লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও এ গল্প করেন নাই এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই—শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেন, তবে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন ; বলিয়া দিলেন, 'এক গাঁয়ে লুন কিনিয়া আর এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।' নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই, এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, 'আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুনের ব্যবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে। দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে এই টাকায় এই গরীবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।' বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, 'এ বড়ো ভালো কথা।' নানক তাঁহার ব্যবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান

করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল, তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল, ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এই-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত লাভ করিলে?' নানক বলিল, 'বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে।' কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে? এত গোল কেন?' যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন, 'তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, 'আর যদি কখনো নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।' এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা-ধরা সমস্তই গুজব; আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলোক।

নানকের উপর আর মারধোর চলে না কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলতখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দেবেন. তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া নানক সুলতানপুরের জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক

বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল। এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এ-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।' ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম উপার্জন করো, পরের উপকার করো, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও—টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেবে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজ-কর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে, কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল ; সে ব্যক্তি বীনা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল ; এবারেও বোধ করি কিঞ্চিত ধনলাভের আশা ছিল, যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না ; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভু বলিয়া কোন্-এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্‌টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট্ বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট্ নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক লইলেন না; তিনি বলিলেন, 'যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর-কাহারও কাছে চাই না।' নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তখন একদিন তিনি মস্‌জিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, 'তুমি কেমন লোক হে। ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!' নানক বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও!' নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে, একবার কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু, আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।' নানক বলিলেন, 'তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।'

নানক অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল, আজ তাহার হিসাব করিয়া দেখ দেখি! আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চার-শো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজ করিয়াছে!

[গুরু নানকের জন্ম খ্রীঃ ১৪৬৯, মৃত্যু খ্রীঃ ১৫৩৮]

অনুশীলনী

১। 'কালু বেশি কাজের লোক কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল'—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কী?

২। রবীন্দ্রনাথ গুরু নানককে 'কাজের লোক' বলিয়াছেন কেন?

৩। নানকের জীবনকথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। শিখদের ধর্মগুরু কে? তাঁহার ধর্মমত কী?

৫। গুরু নানাকের দুই একটি প্রধান 'কাজের' কথা বল।

৬। সুলতানপুরে মুসলমান ফকিরটি নানককে কী উপদেশ দিয়াছিলেন? তাহার অর্থ কী?

৭। কাহার কোন্ কথা 'হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন' এবং 'আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না' ?

৮। নানক 'কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া' কোথায় গেলেন, কী করিলেন ?

৯। কোন্ মোগল সম্রাটের সহিত 'একবার নানকের দেখা হয়', এবং সম্রাটের কোন্ প্রস্তাবের উত্তরে নানক কী বলেন ?

১০। 'সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন'—তাহা কী ?

১১। 'জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও !' —কে কোথায় কী প্রসঙ্গে কাহাকে ইহা বলিয়াছিলেন ? উক্তিটির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

১২। 'যে-সে' পদটি ব্যবহার করিয়া একটি বাক্য রচনা কর।

১৩। 'সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী'—'সুন্দর' ও 'মহৎ' কোন শ্রেণীর পদ ?
['সুন্দর' বিশেষ্য পদ 'আকৃতি'র বিশেষণ, 'মহৎ' বিশেষ্য পদ 'মুখশ্রী'র বিশেষণ।]

১৪। 'কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে একথা শুনি নাই।'—'মুখে' পদটিতে '-এ' বিভক্তি হইয়াছে কোন্ কারকে ?
['মুখে' = মুখ হইতে ; অপাদান কারকে '-এ' বিভক্তি হইয়াছে।]

রেশম

ইউরোপীয়রা চীনদেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার, চীনই রেশমের জন্মস্থান ; চীনেরাও তাহাই বলে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাংলা দেশে খ্রীষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভালো কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ, অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ'। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায হইত—মগধে, পৌণ্ড্র দেশে, ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হল্‌দে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত তাহার রঙ গমের মতো, বকুলের রেশমের রঙ সাদা, বট ও আর আর গাছের রেশমের রঙ ননীর মতো, এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' সকলের চেয়ে ভালো।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জমা। যে অংশ তর্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্র দেশের নাম আছে। এই

দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ বিহার। আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মতো রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভালো। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নাগকেশর বাংলার আর কোনখানে বড়ো দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদার গাছ। মাদারগাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। রেশমি কাপড় যে চীন হইতে বাংলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, এ কথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্রও বাংলায়, সুবর্ণকুড্যও বাংলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়োই গৌরবের কথা। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্বপ্রথম উহার আরম্ভ হয় তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা তো

আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা চাষে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না, গাছবিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা হইত। আর, এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

বাকলের কাপড়

প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। তাহার পর লোকে বাকল পরিত ; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মতো নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিং-এর চারিদিকে বড়ো বড়ো ফটক আছে। দুই-দুইটি থামের উপর এক-একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনি-ঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরন দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেখানে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সুতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত ; শণ, পাট, ধঞ্চে, এমন কি অতসী গাছের ছাল হইতে সুতা বাহির করিত। এখন এই সকল সুতায় দড়ি ও থ'লে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভালো কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালোও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত তাহার নাম 'ক্ষৌম', উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম 'দুকূল'। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড়ো আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাংলাতেই এই বাকলের কাপড়

বুনা হইত। বঙ্গে দুকূল হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মতো উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকূল হইত, তাহার বর্ণ সূর্যের মতো এবং মণির মতো উজ্জ্বল। বাংলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভালো হইত এবং 'দুকূল' একমাত্র বাংলাতেই হইত।

কাপাসের কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভিতর দিয়া একখান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তূলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে সূক্ষ্ম সুতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাংলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাংলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়িতে যত মালদহের রেশমি কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে জোগাইতে হইবে।

(সংক্ষেপিত)

['অর্থশাস্ত্র'—সংস্কৃতে রচিত 'অর্থশাস্ত্র' প্রাচীন ভারতের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা 'কৌটিল্য' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি, 'বিষ্ণুগুপ্ত' ও 'চাণক্য', এই দুই নামেও পরিচিত। এই চাণক্য ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। 'সাঁচী'—মধ্যপ্রদেশের ভূপালের নিকটে একটি গ্রাম। এখানে ছোটো পাহাড়ের উপর প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ ও অন্যান্য পুরাকীর্তির অনেক নিদর্শন এখনও টিকিয়া আছে।]

অনুশীলনী

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখাটি পড়িয়া প্রাচীন বাংলার গৌরবের কথা কী জানিতে পারিলে ?

২। 'পত্রোর্ণ', 'দুকূল', 'ক্ষৌম', 'মস্‌লিন'—এগুলির একটু পরিচয় দাও।

৩। 'ঢাকাই মস্‌লিন' কিভাবে তৈয়ার হইত ?

৪। বাংলায় যে রেশমের চাষ হইত তাহার প্রমাণ কী ?

৫। 'অর্থশাস্ত্র' কাহার লেখা ? কবে লিখিত হয় ? ইহাতে প্রাচীন বাংলার গৌরবের কথা কী আছে ?

৬। 'এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।'—ইহা কাহার উক্তি ?' 'এ বিদ্যা' কোন্ বিদ্যা, এবং কেন ইহা বাংলার পক্ষে 'কম গৌরবের কথা নয়' ?

৭। সাঁচীতে প্রাচীন কীর্তির কী নিদর্শন আছে ?

৮। শব্দার্থ বল : 'ইউরোপীয়', 'পত্রোর্ণ', 'তর্জমা', 'টীকাকার', 'উত্তরীয়', 'স্তূপ', 'স্নিগ্ধ', 'অনায়াসে'।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'পত্রোর্ণ' 'উজ্জ্বল', 'প্রত্যূষ'।

১০। এই রচনাটি হইতে কর্তৃকারকে '-তে' বিভক্তি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দাও।

['পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে,... ।']

১১। 'পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত...'—'পোকা হইতে' কোন্ কারক ?

১২। 'বাকল-পরা অনেক মুনি-ঋষি আছেন।'—এই বাক্যটিতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর পদ আছে ?

১৩। 'অনায়াসে' পদটি একটি বাক্যে ব্যবহার কর।
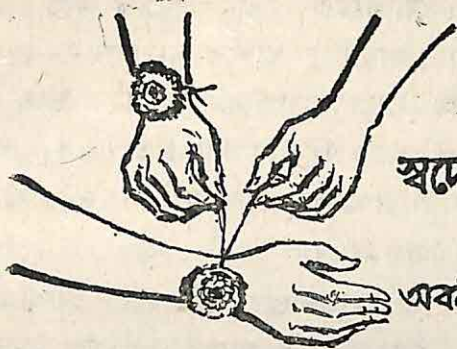
[শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখে-মুখে নিজের স্মৃতিকথা বলিয়া যান এবং শ্রীমতী রানী চন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপে লিপিবদ্ধ স্মৃতিকথা পরে 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' নামে দুইখানি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি 'ঘরোয়া' হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশে যে স্বাদেশিকতার উদ্বোধন হয়, তাহার মনোজ্ঞ বর্ণনা উদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে।]

...এক সময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল, কেউ আমরা তা ব'লতে পারি নে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে বুড়ো মেয়ে, বড়োলোক মুটে মজুর, সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ। সবাই বলে, হুকুম আয়া। আরে, এই হুকুমই বা দিলে কে, কেন। তা জানে না কেউ, জানে কেবল—হুকুম আয়া। তাই মনে হয় এটা সবার ভিতর থেকে এসেছিল—...। বড়ো-ছোটো, মুটে-মজুর সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু ক'রলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্য কিছু ক'রতে হবে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে ব'সলুম। বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁতখুঁত ক'রতে লাগল, বলে, বাবুরা ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী

করুন না—জুতোর দোকান খোলা, ও-সব কেন আবার। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হ'ল দোকানের সামনে—'স্বদেশী ভাণ্ডার'। ঠিক হ'ল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে।… শুধু কি দোকান—জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন হ'চ্ছে। প্লেগ এল, সেবা-সমিতি হ'ল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারি দিক থেকে একটা সেল্ফ্-স্যাক্রিফাইসের ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে—ন্যাশনাল ফণ্ড—টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—মাতৃভাণ্ডার। সবাই চাঁদা দিলে একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে।

রামকেষ্টপুরের রেলের কুলিরা খবর দিলে, বাবুরা যদি আসেন আমাদের কাছে তবে আমরাও টাকা দেব। আমরা রবিকাকা সবাই ছুটলুম। তখন বর্ষাকাল—একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হ'ল। এক মুহুরি টাকা গুনে নিলে। অতটুকু টিনের ঘরে তো মিটিং হতে পারে না। ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি প'ড়ছে—বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নীচে শতরঞ্জি বিছিয়ে বক্তৃতা হ'চ্ছে আর আমি ভাবছি—এই সময়েই যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি টানতে শুরু করে তবেই গেছি আর কি। এই ভাবতে ভাবতে একটা কুলি এসে খবর দিলে, সত্যিই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই হুড়দাড় ক'রে উঠে প'ড়লুম। শ-খানেক টাকা সেই কুলিদের কাছ থেকে পেয়েছিলুম।

… … …

আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি। হাতে অন্নবস্ত্র বরাভয়—এক জাপানি আর্টিস্ট সেটিকে বড়ো ক'রে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে। কোথায় যে গেল পরে পতাকাটা, জানি নে। যাক—রবিকাকা গান তৈরি ক'রলেন, দিনুর উপর ভার প'ড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে ক'রে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান

ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল। তখন সব স্বদেশের কাজ স্বদেশী ভাব এই ছাড়া আর কথা নেই। নিজেদের সাজসজ্জাও ব'দলে ফেললুম। ··

... .

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, বাড়ির গিন্নি থেকে চাকরবাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় ক'রে চরকা কাটতে ব'সে গেছেন।···বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চ'লতে লাগল। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হ'ত। ছোটো ছোটো গামছা ধুতি তৈরি ক'রে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তা-ই প'রে আমাদের উৎসাহ কত।

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি, পল্লী-সমিতির মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম ক'রে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, ব'ললে, আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটে-মজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু করবার, কিছু দেবার।

রবিকাকা একদিন ব'ললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব ক'রতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে।···ঠিক হ'ল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব—রবিকাকা ব'ললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় প'ড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে ব'ললুম, নে সব কাপড়-জামা, নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চ'লল স্নানে, মনিব চাকর একসঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হ'লুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে —মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধূমধাম—যেন একটা

শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চ'লল—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥

এই গানটি সে সময়েই তৈরি হ'য়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চার দিকে ভিড় জ'মে গেল। স্নান সারা হ'ল—সঙ্গে নেওয়া হ'য়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হ'ল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ প'ড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হ'চ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া ম'লছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ ক'রে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা ক'রলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হ'ল, চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হ'য়ে যায় না। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি ক'রলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না ক'রে যেই-না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছানো, আমি সট্ ক'রে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ ক'রে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকার খেয়াল নেই—সোজা এগিয়েই চ'ললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো সব ডাকাবুকো লোক।

এ দিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম, ব'ললুম, কী একটা কাণ্ড হয় দেখো। দীপুদা ব'ললেন, এই রে, দিনুও গেছে, দারোয়ান দারোয়ান, যা শিগ্‌গির, দেখ্‌, কী হ'ল—ব'লে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব ব'সে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলুম, কী, কী হ'ল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, ব'ললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি ব'ললুম, আর মারামারি! সুরেন ব'ললে, মারামারি কেন হবে—ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্‌, বাঁচা গেল।

(সংক্ষেপিত)

['হুকুম আয়া'—হুকুম আসিয়াছে। 'রবিকাকা'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইহারা সহোদর ভাই ছিলেন। 'সিস্টার নিবেদিতা' (ভগিনী নিবেদিতা)—স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, জাতিতে আইরিশ, প্রকৃত নাম মার্গারেট নোবেল; 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া। 'সেল্‌ফ্‌-স্যাক্রিফাইস,—আত্ম-ত্যাগ। 'পশুপতিবাবুর বাড়ি'—উত্তর কলিকাতায় বাগবাজার স্ট্রীটে সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তি পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ি। 'দিনু'—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। 'বরাভয়'—বর ও অভয়; একপ্রকার 'মুদ্রা' বা হাতের ভঙ্গি, যাহাতে আশীর্বাদ ও অভয় জানানো হয়। 'রাজেন মল্লিকের বাড়ি'—উত্তর কলিকাতার চোরবাগান অঞ্চলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুরের বাড়ি, 'মার্বেল প্যালেস' নামে খ্যাত। 'দীপুদা'—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। 'সুরেন' —সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।]

অনুশীলনী

১। বাংলা দেশে স্বদেশীর সূচনা কিভাবে হইয়াছিল বর্ণনা কর।

২। 'রাখীবন্ধন' ব্যাপারটি কী? ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক ছিল?

৩। স্বদেশীর সূচনাতে সাধারণ লোকেও কেমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি কী উপলক্ষ্যে কে রচনা করেন?

৫। 'রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—··· যেন একটা শোভাযাত্রা।'—ইহা কোথাকার কোন্ সময়কার কোন্ ঘটনার বর্ণনা?

৬। অবনীন্দ্রনাথের অনুসরণে 'রাখীবন্ধন' উৎসবের বর্ণনা কর।

৭। ভারতমাতার ছবি কে আঁকিয়াছিলেন, এবং কী উপলক্ষ্যে? ছবিতে ভারতমাতার হাতে কী ছিল?

৮। টীকা লেখ: 'রবিকাকা', 'সিস্টার নিবেদিতা', 'ভারতমাতার ছবি', 'মাতৃভাণ্ডার', 'পশুপতিবাবুর বাড়ি', 'রাখীবন্ধন'।

৯। এই রচনাটিতে কতগুলি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে?

১০। এই রচনাটিতে ইংরেজি শব্দে বাংলা বিভক্তি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার কি?

১১। 'পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি'—'দিয়ে'-স্থানে 'থেকে' ব্যবহার করিলে ক্রিয়াপদের সহিত সম্পর্কে কী পার্থক্য ঘটে?

> ['পাথুরেঘাটা দিয়ে'—অধিকরণ কারক; 'পাথুরেঘাটা থেকে'—অপাদান কারক।]

১২। এই রচনাটি হইতে বিভক্তিচিহ্নযুক্ত ও বিভক্তিচিহ্নহীন কারকের উদাহরণ দাও।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। কোন পদার্থের কী বর্ণ, কিরূপ আকার ও কী আয়তন, এই জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা লাভ করিয়া, পীতবর্ণের পদার্থ হইতে হরিদ্‌বর্ণের পদার্থকে, কিংবা গোলাকার বস্তু হইতে চতুষ্কোণ বস্তুকে, অথবা দীর্ঘ বা স্থূল হইতে খর্ব বা সূক্ষ্ম বস্তুকে পৃথক করিয়া থাকি। বস্তুতে বস্তুতে ঘর্ষণ করিলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, অথবা প্রাণিগণ যে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহার জ্ঞান আমরা কর্ণ দ্বারা লাভ করিয়া থাকি, এবং মধুর শব্দ হইতে কর্কশ শব্দকে, মৃদু ধ্বনি হইতে চীৎকার ধ্বনিকে এবং এক প্রাণীর রব হইতে অপর প্রাণীর রবকে পৃথক করিতে সমর্থ হই। নাসিকা দ্বারা আমরা বস্তুর গন্ধ জানিতে পারি এবং এক পদার্থের গন্ধ হইতে অপর পদার্থের গন্ধকে পৃথক করি। যেমন প্রায় বস্তুরই একটা-না-একটা গন্ধ আছে, তেমনি তাদের একটা-না-একটা স্বাদও আছে। রসনা দ্বারা আমরা সে স্বাদ গ্রহণ করিয়া মিষ্ট হইতে তিক্ত ও তিক্ত হইতে কসায় প্রভৃতি বস্তুকে পৃথক করিতে পারি। ত্বক্ বা স্পর্শশক্তি দ্বারা আমরা সেইরূপ বস্তুর কোমলতা, কাঠিন্য, শৈত্য, উত্তাপ প্রভৃতি জানিতে পারি। এই সকল ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারিতাম না।

কিন্তু কেবল চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারাও আমরা সকল জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, তাহা পশুদিগেরও আছে। কিকট শব্দ শুনিলে শৃগাল, কুকুর, প্রভৃতিও ভয়ে পলায়ন করে। উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া ব্যাঘ্রাদি দূরে চলিয়া যায়, ও পতঙ্গকুল উড়িয়া আসিয়া তাহাতে পড়িয়া পুড়িয়া

মরে। বিড়াল, মেষ, ছাগ বা গাভীতে তিক্ত বা কসায় দ্রব্য আহার করিতে চাহে না। উত্তপ্ত লৌহখণ্ড গায়ে লাগিলে তাহাদেরও ক্লেশ হইয়া থাকে, এবং তীব্র গন্ধে তাহারাও নাসিকা কুঞ্চিত করে। কিন্তু আমরা এই সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হই না। আমরা এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়া বস্তুর শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকি। পীত-বর্ণের বস্তুকে এক শ্রেণীর, হরিদ্ বস্তুকে আর এক শ্রেণীর; কঠোর বস্তুকে এক শ্রেণীর, কোমল বস্তুকে আর এক শ্রেণীর; সুগন্ধ দ্রব্যকে এক শ্রেণীর, দুর্গন্ধ দ্রব্যকে অপর এক শ্রেণীর; এইরূপে ইহাদিগের জাতি বিচার করি। আবার এইরূপ একজাতীয় বস্তুরও অপরাপর গুণাবলি বিচার করিয়া, সেই সেই গুণ অনুসারে, তাহাদিগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করি। দশটি পীতবর্ণের বস্তু একত্র হইলে, তাহাদের আকার বা আয়তন, বা কাঠিন্য, বা গন্ধ, ইত্যাদি গুণ অনুসারে, তাহাদের ভেদাভেদ করিয়া থাকি। পশুর এরূপ বিচারশক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বিচারশক্তিকে মন বলে। সারথি না হইলে যেমন রথ চলে না, এই মন না থাকিলে ইন্দ্রিয়কুলও তেমনি অচল হইয়া থাকিত। এই মনের দ্বারা আমরা গত বিষয় স্মরণ করিতে পারি, অনাগত বিষয়ের অনুমান করিতে সমর্থ হই। ইহারই দ্বারা আমরা এই জগতের সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া, জগৎপিতা জগদীশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে সমর্থ হই।

বাহিরের ইন্দ্রিয় এবং অন্তরের মন ব্যতীত আমাদিগকে পরমেশ্বর আরও কতকগুলি বৃত্তি দিয়াছেন। এই সকল বৃত্তি না থাকিলে আমরা কখনও মনুষ্য-পদ-বাচ্য হইতে পারিতাম না। আমাদের হৃদয় আছে। আমরা তাই জগতের ইতর প্রাণীদিগকে, মনুষ্যকে এবং সর্বোপরি মানবের স্রষ্টা ভগবানকে ভালোবাসিতে পারি। এই ভালোবাসাতেই জগতের শ্রেষ্ঠতম সুখ পাওয়া যায়। যে ভালো-বাসিতে পারে না, তাহাকে হৃদয়হীন কহে। হৃদয়হীন ব্যক্তি কেবল আপনার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অপরের সুখে সে সুখী হয় না; অপরের দুঃখে সে দুঃখ অনুভব করে না। পরদুঃখানুভূতি যাহার

নাই, সে পশু, মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত। হৃদয় এবং মন ব্যতীত গুণিজনের অপর একটি প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে ইচ্ছা কহে। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আমরা সকল বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান লাভ করি; এই জ্ঞান লাভ করিয়া ভালো ও মঙ্গলকর বিষয়কে প্রীতি করি; মন্দ ও অমঙ্গলকর বিষয়কে ঘৃণা করি; এবং সর্বশেষে ইচ্ছার দ্বারা এই সকল সৎ ও মঙ্গলকর বিষয়কে লাভ করিতে এবং অসৎ ও অমঙ্গল বিষয়কে সর্বদা বর্জন করিতে চেষ্টা করি। আমরা এইরূপ করি, বিধাতার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রতিপালন করাই ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিপালন না করিলে, কেহ কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

অনুশীলনী

১। জ্ঞানের দ্বার কী? কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কী জ্ঞান লাভ করিতে পারি?

২। মন কী ও তাহার কী কাজ? হৃদয়বান্ মানুষের লক্ষণ কী?

৩। ধর্ম কাহাকে কহে? কে 'পশু, মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত'?

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 'ব্যাঘ্রাদি', 'ভেদাভেদ', 'জগদীশ্বর', 'পরমেশ্বর', 'সর্বোপরি'।

৫। শব্দার্থ বল: 'ত্বক্', 'হরিৎ', 'খর্ব' 'স্থূল', 'সূক্ষ্ম', 'কসায়', 'শৈত্য', 'পীত', 'মনুষ্য-পদ-বাচ্য', 'ব্যতীত', 'পরদুঃখানুভূতি'।

৬। '…ভয়ে পলায়ন করে'—'ভয়ে' পদে '-এ' বিভক্তি কেন হইয়াছে?

৭। 'বিড়াল, মেষ, ছাগ বা গাভীতে তিক্ত বা কসায় দ্রব্য আহার করিতে চাহে না।'—বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় দেখাইয়া দাও। 'গাভীতে' পদের সহিত বাক্যের ক্রিয়া-পদের কী সম্পর্ক?

[রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের একটি অধ্যায় হইতে কিয়দংশ এখানে গৃহীত হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয় সিপাহী ও সাধারণ মানুষের উপর নৃশংস নির্যাতন চালায়। পাটনা শহরে ইংরেজদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ডাক্তার লায়াল নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিতে গিয়া নিহত হন। পাটনার কমিশনার টেলর সাহেব পীর আলি নামক এক পুস্তক-ব্যবসায়ীকে ডাক্তার লায়ালের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং বিচারের ছলে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বেইমানির বিনিময়ে প্রাণরক্ষার সুযোগ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া পীর আলি কিভাবে বীরের মতো মৃত্যু বরণ করেন, উদ্ধৃত অংশে লেখক তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।]

এই ব্যক্তির আদি বাসস্থান লখনউতে ছিল। কথিত আছে, পীর আলি যেরূপ সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন, সেইরূপ ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষী ছিল। উপস্থিত গোলযোগের সময়ে লখনউর উত্তেজিত মুসলমান-দিগের সহিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিতেও ইহার ঔদাস্য হয় নাই। পাটনার কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই ব্যক্তির বন্দুকের গুলিতে ডাক্তার লায়ালের প্রাণবিয়োগ

হয়। সুতরাং পীর আলি বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সে যখন কমিশনার টেলর সাহেব এবং অপরাপর ইংরেজের সমক্ষে আনীত হয়, তখন তাহার হস্তপদ কঠিন লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল; তাহার পরিধেয় বস্ত্র ঘর্মে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল; তাহার দেহের পার্শ্বভাগে আঘাত লাগাতে শোণিত-স্রোত বহির্গত হইয়া তদীয় ঘর্মাক্ত বস্ত্র রঞ্জিত করিয়াছিল।

পীর আলি এই অবস্থায় কমিশনারের নিকট উপনীত হইলে, কমিশনার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপস্থিত গোলযোগ সম্বন্ধে এমন কোন গোপনীয় সংবাদ দিতে পারে কিনা যে, গভর্নমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন। কমিশনারের কথায় নিগড়বদ্ধ মুসলমান ব্যবসায়ী এরূপ সাহস, এরূপ দৃঢ়তা এবং এরূপ নির্ভীক ভাব দেখাইল যে, সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ইংরেজও বোধ হয় তদবস্থায় ঐরূপ অটল ভাব দেখাইতে পারেন না।

পীর আলি গভীর ভাবে উত্তর করিল,—"এমন কতকগুলি কার্য আছে যে, যাহার জন্য জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়; আবার এমন কতকগুলি কার্যও আছে, যাহার জন্য জীবন বিসর্জনের আবশ্যকতা দেখা যায়।"

ইহার পর সে ইংরেজদিগের অত্যাচার, বিশেষতঃ কমিশনার সাহেবের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া কহিল,—"আপনি আমার ফাঁসি দিতে পারেন; আমার ন্যায় অপর লোকেও প্রতিদিন ফাঁসিকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমার স্থলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইবে। আপনাদের উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না।"

অনন্তর পীর আলি জোড় হাতে ও সাতিশয় বিনীত ভাবে কমিশনারকে কহিল,—"আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।"

কমিশনার তাহাকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতে অনুমতি দিলেন।

পীর আলি জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার আবাসবাটি?"

কমিশনার উত্তর করিলেন,—"ভূমিসাৎ হইবে।"

"আমার সম্পত্তি?"

"বাজেয়াপ্ত হইবে।"

"আমার সন্তানগণ ?"

এইবার পীর আলির ভাবান্তর ঘটিল। স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের নামে এই প্রথম ও শেষবার তাহার কণ্ঠস্বরে কাতর ভাবের অভিব্যক্তি হইল।

কমিশনার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তানগণ কোথায় ?"

"অযোধ্যায়।" পীর আলি বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে এই উত্তর দিল।

কমিশনার সেই প্রদেশের বর্তমান অবস্থার উল্লেখপূর্বক এ বিষয়ে কোনরূপ অঙ্গীকার করতে অসম্মত হইলেন। পীর আলি আর কোন কথা না বলিয়া, যথোচিত সম্মানের সহিত অভিবাদনপূর্বক ধীরভাবে বধ্যভূমিতে গমন করিল।

অবিলম্বে ফাঁসিকাষ্ঠে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার বাসগৃহ সমভূমিতে পরিণত এবং তাহার সম্পত্তি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অধিকৃত হইল।

অনুশীলনী

১। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন শহীদের নাম কর, এবং তিনি কিভাবে বীরের মতো মৃত্যু বরণ করেন বর্ণনা কর।

২। পীর আলির জীবনের আদর্শ কী ছিল ?

৩। পীর আলির মৃত্যু বীরের মৃত্যু—কেন ?

৪। ব্যাখ্যা কর: 'এমন কতকগুলি কার্য আছে যে,···আবশ্যকতা দেখা যায়।'

৫। শব্দার্থ বল: 'ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষী', 'ঔদাস্য', 'আর্দ্র', 'নিগড়বদ্ধ', অভিব্যক্তি', বাষ্পনিরুদ্ধ', 'অঙ্গীকার', 'প্রাণবিয়োগ', 'অভিবাদনপূর্বক'।

৬। 'ঔদাস্য', 'আবশ্যকতা', 'দণ্ডায়মান' কোন্ শ্রেণীর পদ ?

৭। 'সন্তানগণ'—এস্থলে 'সন্তান' কোন্ লিঙ্গ ?

['বীরবল' ছদ্মনামে পরিচিত, বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান্ পুরুষ মনীষী প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' পুস্তকের প্রথম ভাগ হইতে কিয়দংশ সামান্য সংক্ষেপিত আকারে এখানে পরিবেষণ করা হইল।]

ভারতবর্ষের উত্তরাপথ প্রায় সমস্তটাই ট্রপিক অফ ক্যানসরের উত্তরে ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার নিচে। ফলে দক্ষিণাপথে শীত ঋতু ব'লে কোনও ঋতু নেই। জনৈক ইংরেজ ব'লেছেন যে দক্ষিণাপথ হ'চ্ছে নয় মাস গরম, বাকি তিন মাস আরো গরম। উত্তরাপথে কিন্তু শীত গ্রীষ্ম দুই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকাল উত্তরাপথের মতো অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমত উঁচু, দ্বিতীয়ত তার তিন দিক সমুদ্রে ঘেরা।

তারপর ভারতবর্ষের এ দুই ভূভাগের মাটিও এক জাতের নয় এবং তাদের গুণাগুণও পৃথক। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানত মাটি নিয়ে। গাছপালা তৃণ শস্য সব মাটিতেই জন্মায়।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হ'চ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র। ও চামড়ার নিচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না,—জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। মা বসুন্ধরা অন্তরে অন্তরে পাষাণী।

পৃথিবীর মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। অর্থাৎ হয় পাথরকে পুড়িয়ে বা গুঁড়িয়ে, না হয় গলিয়ে মাটি তৈরি ক'রতে হয়। জলের

কাজ হ'চ্ছে পাথরকে চূর্ণ করা ও অগ্নির কাজ হ'চ্ছে তাকে দ্রব করা।

পাহাড় থেকে নদ নদী বেরয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণ পাষাণ ব'য়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা পলিমাটি বলি। সেই মাটি-ই প্রধানত গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরি।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ বলি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যের দেশ তখন ছিল জলমগ্ন। তারপর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদ-নদীর কৃপায় উত্তরাপথ হ'য়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি ক'রলে। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন ভূগঠনতত্ত্ব প'ড়বে, তখন এ দেশের গাছপাথরের বয়সের হিসেব পাবে।

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি পলিমাটি নয়, অর্থাৎ নদ-নদীর দান নয়। আগ্নেয়গিরি হ'তে যে গলা পাথরের উদগম হ'য়েছে, তাই হ'চ্ছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এই দুই মাটি এক জাতের নয়, এবং এ দুয়ের ধর্ম এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন্ দেশে, কোন্ দিক থেকে কী বাতাস বয়, তার উপর। সিন্ধুদেশ হ'চ্ছে অনাবৃষ্টির ও আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্তী দেশ পরিমিত বৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ ও তার পূর্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা মৌসুম (monsoon) নামে আখ্যাত করি, তার চলবার পথ হ'চ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে উত্তর-

পূর্ব কোণে। এ বাতাস প্রথমে মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়, তারপর পশ্চিম ঘাটে বাধা পেয়ে ঘুরে এসে বাংলায় ঢোকে, তখন তার গতি হয় দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে। এই বাতাস বাংলা ও আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তারপর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষা ঋতু দেখা দেয়। মৈসুম কিন্তু পঞ্চনদ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এজন্য বাংলায় যখন বৃষ্টি হয়, পঞ্জাব তখন শুখনো। পঞ্জাবে শীতকালেই বর্ষাকাল।

ভারতবর্ষের লোক শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবি। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরে একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হ'য়েছিল পুরাকালের গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরীতে। আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্তমান য়ুরোপের মনের উপর প্রভুত্ব ক'রছে।

রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ ক'রেছে শহরে ও সেইখানেই লালিত পালিত, অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ ক'রেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত পালিত হ'য়েছে।

অনুশীলনী

১। উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের প্রধান পার্থক্য কি কি ?

২। 'মাটি হ'চ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র'—উক্তিটির অর্থ কী ?

৩। "মা বসুন্ধরা অন্তরে অন্তরে পাষাণী।" একথা বলিবার কারণ কী ?

৪। উত্তরাপথ পূর্বে কী ছিল ? 'ভারতবর্ষ' নামক মহাদেশের সৃষ্টি হইল কিভাবে ?

৫। 'উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার।'—একথা বলিবার কারণ কী ?

৬। 'মৈসুম বায়ু' কী ? ইহার গতি কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে ? ইহার কাজ কী ?

৭। 'ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ।'—কেন ?

৮। 'আথেন্স' ও 'রোম' কোথায় ?

৯। কোন্ প্রাচীন সভ্যতা 'কতক অংশে বর্তমান য়ুরোপের মনের উপর প্রভুত্ব ক'রছে ?' এই সভ্যতার সৃষ্টি হয় কোথায় ? ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সহিত এই সভ্যতার পার্থক্য কী ?

১০। ভারতবর্ষের সভ্যতা কোথায় জন্মগ্রহণ করে ?

১১। 'নিচে', 'শীত', 'গরম', 'বেশি', 'দক্ষিণ', 'গুণ', 'অন্তর', 'প্রাচীন', 'গ্রাম', 'জন্ম', 'অতিবৃষ্টি'—এই শব্দগুলির প্রত্যেকটির বিপরীতার্থক শব্দ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।'

১২। 'পাহাড় থেকে নদ নদী বেরয়,…'—এই বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় দেখাও। বাক্যটিতে কোন্ কোন্ কারক পদ আছে ?

১৩। এই রচনাটিতে বিভক্তি-যোগে অধিকরণ কারকের কয়টি দৃষ্টান্ত আছে ?

১৪। অব্যয়ের যোগে অপাদান কারকের দুইটি উদাহরণ এই রচনাটিতে দেখাও।

১৫। শব্দার্থ বল : 'দ্রব্য', 'মগ্ন', 'আগ্নেয়গিরি', 'পরিমিত', 'অবসান'।

১৬। 'ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ ক'রেছে বনে,…'—'ভারতবর্ষের' পদের '-এর' বিভক্তি এবং 'বনে' পদের '-এ' বিভক্তি কেন হইয়াছে ?

১৭। 'নগরী' শব্দে যথাযোগ্য বিভক্তি যোগ করিয়া তাহাতে অধিকরণ কারক রূপে বাক্যে ব্যবহার কর।

১৮। 'নগরী' শব্দ কোন্ লিঙ্গ ? বিপরীত লিঙ্গে ইহার কী রূপ ?

পথিপার্শ্বে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস হইতে একটি পরিচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ দত্ত গোবিন্দপুরের জমিদার। তাঁহার স্ত্রী সূর্যমুখী, স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলে, মনঃক্ষোভে গৃহত্যাগ করেন। তাহার পরবর্তী ঘটনা উদ্ধৃত অংশে বিবৃত হইয়াছে।]

বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে তো দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসাময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান।

রাত্রি অন্ধকার হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক

একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভালো। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দ-সূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কী একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্ তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে

একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আসছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদগ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্রবস্ত্র অত্যন্ত মলিন;—এবং শত স্থানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্রকেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট

আমি দেখিতেছি। কিন্তু তাপ-সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্রবস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয় অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু ক'রে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া, অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল, "আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি র'য়েছে। তুমি কি সধবা?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কী বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কী?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্যমুখী।"

['ঘুটিং'—কাঁকড়, নুড়ি।]

অনুশীলনী

১। 'এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভালো।' —কাহার রচনাতে এই উক্তিটি আছে, এবং কী প্রসঙ্গে? উক্তিটির সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাও।

২। 'এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই।' কাহার উক্তি? কে 'ঠাকুর'?

৩। 'আমার নাম সূর্যমুখী।'—কোথায় কী অবস্থায় কাহার নিকট সূর্যমুখী নিজের নাম জানাইল? এই উক্তিটি কাহার লেখা কোন্ বইতে আছে?

৪। সূর্যমুখীকে কে কোন্ অবস্থায় কোথায় দেখিতে পাইলেন?

৫। ব্রহ্মচারীর চেহারা ও বেশ কিরূপ ছিল? তিনি সূর্যমুখীকে লইয়া কী করিলেন?

৬। হরমণি কিরূপে সূর্যমুখীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন?

৭। 'যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।'—কী প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন?

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে বর্ষাকালের দুর্যোগময় রাত্রির রূপ বর্ণনা কর।

৯। ব্যাখ্যা কর :—'যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান।'

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'সূর্যোদয়', 'দুর্দিন', 'শিরোমালা', 'কৃষ্ণাবগুণ্ঠন', 'বিদ্যুদালোক', 'কাতরোক্তি', 'প্রতীক্ষা', 'মরণোন্মুখী'।

১১। 'ব্রহ্মচারী', 'মসীময়ী', 'সংসারত্যাগী', 'মরণোন্মুখী', 'অনাথিনী', 'পীড়িতা' শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ? বিপরীত লিঙ্গে এইগুলির রূপ কী হইবে?

১২। শব্দার্থ বল : 'মসী', 'অবগুণ্ঠন', 'গৈরিক', 'বৃক্ষশিরোমালা', 'মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত', 'ব্যথাব্যঞ্জক', 'কবরী', 'পর্ণকুটীর', 'আর্দ্র', 'কোটরপ্রবিষ্ট', 'নিমীলিত', 'সংজ্ঞালব্ধ', 'মুমূর্ষু', 'অপ্রতিভ'।

১৩। 'নিমীলিত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ দিয়া একটি বাক্য রচনা কর।

১৪। 'আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন'—এস্থলে 'কৃষ্ণাবগুণ্ঠন' পদটির সার্থকতা কী?

১৫। 'ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন', 'ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল।'—নিম্নরেখ পদগুলির পরিচয় নির্দেশ কর।

বালকের আশ্চর্য মেধা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর প্রথম সন্তান প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তাঁহার অসম্পূর্ণ আত্মচরিতে নিজের শৈশব ও বাল্যের কথা কিছু লিখিয়াছেন। সেই আত্মচরিত হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল। বীরসিংহ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, আরও শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। পথে আসিতে আসিতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে ব্যাপারে তাঁহার আশ্চর্য মেধার পরিচয় দেন, উদ্ধৃত অংশে তাহার বর্ণনা আছে।]

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষাবিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে পিতৃদেব মাইল স্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথম বার কলিকাতায় আসিবার সময় সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া বাটনাবাটা শিলের মতো একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, 'বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন।' তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, 'ও শিল

নয়, উহার নাম মাইল স্টোন।' আমি বলিলাম, 'বাবা, মাইল স্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।' তখন তিনি বলিলেন, 'এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ ; স্টোন শব্দের র্থঅ পাথর ; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে ; উহাতে এক, দুই, তিন, প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে ; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ।' এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায়, 'একের পিঠে নয় উনিশ,' শিখিয়াছিলাম। দেখিবা-মাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, 'তবে এটি ইঙ্গরেজীর এক আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়।' অনন্তর বলিলাম, 'তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠারো, তাহার পরটিতে সতরো, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব।' তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে ; প্রথম মাইল স্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব।' আমি বলিলাম, 'সেটি দেখিবার আর দরকার নাই ; এক অঙ্ক এইটিতেই পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।'

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল স্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল স্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, 'বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল।' পিতৃদেব বলিলেন, 'কেমন চিনিয়াছ তাহার পরীক্ষা করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি নবম অষ্টম সপ্তম, এই তিনটি মাইল স্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি 'এটি নয়, এটি আট, এটি সাত,' এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া,

নয় আট সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল স্টোনটি দেখিতে দিলেন না ; অনন্তর, পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কোন্ মাইল স্টোন বল দেখি।' আমি দেখিয়া বলিলাম, 'এই মাইল স্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে ; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরু মহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন ; তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া 'বেশ বাবা বেশ' এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, 'দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।'...

['কৌতুহলাবিষ্ট'—কৌতূহলী। 'জিজ্ঞাসিলাম'—জিজ্ঞাসা করিলাম। 'চটী'—পান্থশালা। 'সমভিব্যাহারী'—সঙ্গী। 'সম্বোধিয়া'—সম্বোধন করিয়া]

অনুশীলনী

১। 'মাইল স্টোন' কী ? 'মাইল স্টোন' দেখিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র কী শিক্ষা লাভ করেন ?

২। 'প্রথম বার কলিকাতায় আসিবার সময়, ঈশ্বরচন্দ্রের 'শিক্ষাবিষয়ে' 'কিরূপ ক্ষমতা'র পরিচয় পাওয়া যায় ?

৩। 'পিতৃদেব মাইল স্টোনের উপাখ্যান বলিলেন।'—'পিতৃদেব' কে ? 'মাইল স্টোনের উপাখ্যান' কী ? এই উপাখ্যানে কাহার কিরূপ ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায় ?

There are traces of racial reference in This piece.

Rajputs: Conflict between the mogals and the

আশ্চর্য!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটকের প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য সংক্ষেপিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। যোধপুরের রাণা যশোবন্ত সিংহ ছিলেন মোগল সম্রাট্ ঔরংজীবের একজন প্রধান সেনাপতি। আফগানিস্থানের কাবুলে এক যুদ্ধে যশোবন্তের মৃত্যু হইলে, তাঁহার সেনাপতি দুর্গাদাস যশোবন্তের বিধবা রানী ও তাঁহার শিশুপুত্রকে লইয়া দেশে ফিরিবার পথে ঔরংজীবের গূঢ় চক্রান্তে দিল্লীতে অবরুদ্ধ হন। দুর্গাদাস ও যশোবন্তের রানী সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। সেনাপতি দিলীর খাঁ এই আশ্চর্য পলায়নের ঘটনা এই দৃশ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।]

[স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—প্রভাত। ঔরংজীব একাকী।]

ঔরংজীব ॥ কী!—যশোবন্তের রানী ২৫০ শত মাত্র সৈন্য নিয়ে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ ক'রে চ'লে গেল!—আর সে মোগল সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং দিলীর খাঁ!—এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে।—দৌবারিক!

[নেপথ্যে]—খোদাবন্দ!

ঔরংজীব ॥ সেনাপতি দিলীর খাঁ!—

[নেপথ্যে]—জো হুকুম।

ঔরংজীব ॥ আমি একথা বিশ্বাস ক'রতে পারি না। ২৫০ মাত্র রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগলের ব্যূহ ভেদ ক'রে গেল। নিশ্চয় এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা আছে।—কিন্তু সেনাপতি দিলীর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে, এই বা কী ব'লে বিশ্বাস করি! দিলীর খাঁ—আমার বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহায়,—বার্ধক্যের মন্ত্রী দিলীর

খাঁ—সরল, মহৎ, উদার দিলীর খাঁ—বিশ্বাসঘাতক হবে! আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না। কিন্তু ২৫০ রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগল সৈন্য কেটে বেরিয়ে গেলে!···নিশ্চয় এর ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে।—এই যে দিলীর খাঁ।

(দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন)

দিলীর ॥ বন্দেগি জাহাঁপনা!

ঔরংজীব ॥ দিলীর খাঁ, তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি জানতে যে, এ কথা সত্য কি না যে—

দিলীর ॥ সম্রাট্ যা শুনেছেন সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরংজীব ॥ আমার কথা শেষ ক'রতে দাও—এ কথা সত্য কি না যে আড়াই শত মাত্র রাজপুত ৫০০০ মোগল সৈন্য ভেদ ক'রে চ'লে গিয়েছে।

দিলীর ॥ হাঁ জাহাঁপনা, একথা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরংজীব ॥ আর সে সৈন্যের সেনাপতি তুমি!

দিলীর ॥ হাঁ জনাব!

ঔরংজীব ॥ যুদ্ধ ক'রেছিলে?

দিলীর ॥ জনাব, এই যুদ্ধে আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যের ৫০০ বেঁচেছে; রাজপুতদের মধ্যে বোধ হয় পাঁচটি।

ঔরংজীব ॥ আর যশোবন্তের রানী?

দিলীর ॥ তিনি সামন্তদের সঙ্গে উদয়পুর অভিমুখে গিয়েছেন।

ঔরংজীব ॥ শিশু?

দিলীর ॥ শিশুকে সেই সৈন্যদের মধ্যে দেখি নাই জনাব। তবে যশোবন্তের রানীর বুকের উপর একটি তিন বৎসরের কন্যা ছিল।

ঔরংজীব ॥ মোগল সৈন্য কি মেষের অধম হ'য়েছে যে, একটা নারীর গতি প্রতিরোধ ক'রতে পারলে না?—সঙ্গে তার আড়াই 'শ মাত্র সৈন্য?

দিলীর ॥ জানি না জাহাঁপনা! কিন্তু যখন সেই নারী মোগল সৈন্য-ব্যূহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—নিরবগুণ্ঠনা, আলুলায়িতকেশা,

বক্ষে সুপ্ত কন্যা—তখন মহারানীর আড়াই শ' সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই মোগল-সৈন্য-কৃষ্ণমেঘের উপর দিয়ে তিনি বিদ্যুতের মতো এ'সে চ'লে গেলেন। কেউ তাকে স্পর্শ ক'রতে সাহস ক'রলে না।
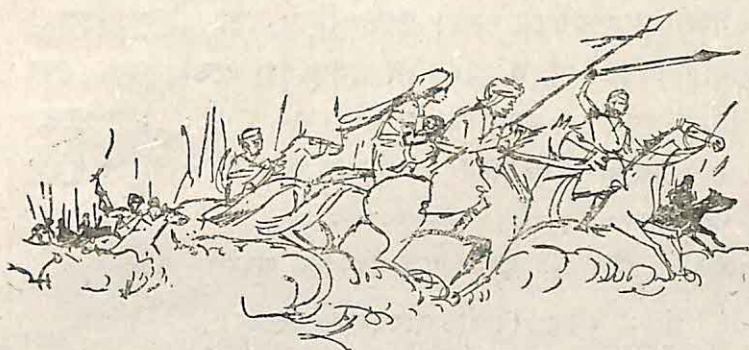
ঔরংজীব ॥ আর তুমি!

দিলীর ॥ আমি দূরে দাঁড়িয়ে অপূর্ব মাতৃমূর্তি দেখলাম। ব'লতে চেষ্টা ক'রলাম—"ধর যশোবন্তের রানীকে।"—কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। তরবারি খুলতে চেষ্টা ক'রলাম—তরবারি উঠল না। পিস্তল নিলাম—পিস্তল হাত থেকে প'ড়ে গেল।

ঔরংজীব ॥ দিলীর খাঁ! তুমি কি পাগল হ'য়েছ?

দিলীর ॥ হয়তো হ'য়েছি। জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন বোধ হ'ল যে, আমি আর একটা মানুষ হ'য়ে গেলাম! এক মুহূর্তে কে যেন এসে আমার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত ক'রে রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে। একটা নূতন জগৎ দেখলাম।

ঔরংজীব ॥ তাই তুমি ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সঙের মতো খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?

দিলীর ॥ হাঁ জনাব! দেখলাম সে এক মহিমাময় দৃশ্য! কী সে মহিমা! আশ্চর্য!—আলুলায়িত কেশা নারী! বুকের উপর তার ঘুমন্ত শিশু। কী সে দৃশ্য জাহাঁপনা! নির্মেঘ উষার চেয়ে নির্মল, বীণার ঝংকারের চেয়ে সংগীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র

—সেই মাতৃমূর্তি!—আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঔরংজীব॥ তারপর?

দিলীর॥ তারপর সে মূর্তি অন্তর্হিত হ'লে জ্ঞান হ'ল। চেঁচিয়ে উঠলাম, "আক্রমণ করো!" আমাদের ৫০০০ তরবারি সেই সন্ধ্যালোকে ঝ'লসে উঠল! বিপক্ষ ফিরে দাঁড়াল। যুদ্ধ বাধল। মানুষ প'ড়তে লাগল, ভূমিকম্পে বালুস্তূপের মতো। যুদ্ধ শেষ হ'লে দেখলাম—আমাদের পাঁচ শ' সৈন্য অবশিষ্ট; বিপক্ষ পক্ষের একজনও না। মৃতদের মধ্যে দুর্গাদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঔরংজীব॥ দিলীর! তুমি মেয়ে মানুষেরও অধম। যাও।

(উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

['দৌবারিক'—দ্বারপাল। 'খোদাবন্দ' (ফার্সী শব্দ)—মালিক, প্রভু। 'বন্দেগি' (ফার্সী শব্দ)—সেলাম, নমস্কার। 'জনাব' (ফার্সী শব্দ)—সম্মানসূচক সম্বোধন; হুজুর। 'জাহাঁপনা' (ফার্সী শব্দ)—জগতের আশ্রয়, প্রভু; বাদশাহ্‌কে সম্বোধন করিতে ব্যবহৃত হয়।]

অনুশীলনী

১। দিলীর খাঁ কেন যশোবন্তের রানীকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলেন না?

২। উপরে বর্ণিত ঘটনায় দিলীর খাঁ চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে?

৩। কোন্ দৃশ্য দিলীর খাঁর নিকট 'নির্মেঘ উষার চেয়ে নির্মল,' 'ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র' বোধ হইল?

৪। 'তুমি মেয়ে মানুষেরও অধম।'—কাহার উক্তি! কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? কী প্রসঙ্গে?

৫। 'ধর যশোবন্তের রানীকে।'—কে যশোবন্ত? কে তাঁহার রানীকে ধরিবার কথা বলিতেছেন এবং কেন?

৬। 'মানুষ প'ড়তে লাগল, ভূমিকম্পে বালুস্তূপের মতো।' ঘটনাটি বর্ণনা কর। উদ্ধৃত বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় নির্দেশ কর।

৭। ঔরংজীব কাহার সম্পর্কে বলেন যে সে, বিশ্বাসঘাতক হবে, আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না', এবং কেন তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না ?

৮। দিলীর খাঁ কি সত্যই 'বিশ্বাসঘাতক' ছিলেন ?

৯। 'আমি দূরে দাঁড়িয়ে অপূর্ব মাতৃমূর্তি দেখলাম।'—ইহা কাহার উক্তি ? 'অপূর্ব মাতৃমূর্তি' বলিবার সার্থকতা কী ?

১০। ব্যাখ্যা কর : 'এক মুহূর্তে কে যেন এসে···রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে।'

১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'সৈন্যাধ্যক্ষ', 'বজ্রাহত', 'সন্ধ্যালোকে'।

১২। শব্দার্থ লেখ : 'আলুলায়িতকেশা', 'নিরবগুণ্ঠনা', 'মোগল-সৈন্য-কৃষ্ণমেঘ', 'মহিমময়', 'নির্মেঘ', 'অন্তর্হিত'। প্রথম দুইটি শব্দের বিপরীত লিঙ্গে কী রূপ ?

১৩। 'নির্মেঘ' ও 'নির্মল' শব্দ দুইটিকে এক-ই বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করিয়া একটি বাক্য রচনা কর।

১৪। 'মৃতদের মধ্যে দুর্গাদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।' —'দুর্গাদাস' কোন্ কারক ? 'মৃতদের' এখানে কোন্ শ্রেণীর পদ ?

১৫। 'তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি···'—এখানে 'তোমায়' রূপের পরিবর্তে অন্য কোন্ রূপের ব্যবহার করা যাইতে পারে ?

নিউটনের কীর্তি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

নিউটনের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার মতো জ্ঞানী লোক এ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। পুরাতন হইলেও নিউটনের সম্বন্ধে একটি কথা আজ তোমাদিগকে বলিব।

আড়াই শত বৎসর পূর্বে [১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে] ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন, সেই বৎসর গালিলিও'র মৃত্যু হয়। গালিলিও ইতালিদেশবাসী ছিলেন। গালিলিও'র নামও পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত। গালিলিও পেণ্ডুলাম-যুক্ত ঘড়ি বাহির করেন। গালিলিও প্রথমে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা আকাশ পরীক্ষা করেন। গালিলিও আরও অনেক বড়ো বড়ো কাজ করিয়া-ছিলেন, সম্প্রতি সে কথা বলিবার দরকার নাই। গালিলিও খুব বড়লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড়লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ কী? তোমরা হয়তো শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটি গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া কী ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয়তো তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু এই গল্পে নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুতঃ নিউটন ঐরূপ একটা কাজ কিছু করেন নাই।

তবে নিউটনের বাহাদুরি কিসে? অন্য লোকে দেখে, ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে; নিউটন প্রথম দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনই ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহা-ই নহে। অত বড়ো প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে, সে আবার কী! তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন? ফল-ই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই,—পৃথিবী খুব বড়ো, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক দূর কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোটো, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়াও তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, ঠিক সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়; চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

যেদিন চন্দ্রের সৃষ্টি, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত চন্দ্র

ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে, এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিক দূর চলিয়া, তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিসটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগ দিতে পারিলে হয়তো গঙ্গা পার হইয়া হাবড়াতে, না হয় গুজরাটে, না হয় মক্কায় গিয়া পড়িত। আমরা সেরূপ বেগ দিতে পারি না, তাই অত দূর যায় না। যত দূরেই যাউক, পৃথিবীতে উহাকে পড়িতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগ দিলে পৃথিবীতে না পড়িয়া, একেবারে পৃথিবীটা ঘুরিয়া, আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছছাড়া হইতে পারিত না।

তাই মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্ব মুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই চন্দ্র পূর্ব মুখে চলিতে চলিতে সাতাশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্ব মুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র এতদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত।

একগাছি লম্বা সুতার এক প্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তারপর ডা'ন হাতের দুটি আঙুলে করিয়া ঢিলটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও; সুতাগাছটি যেন বরাবর টানের উপর থাকে। আঙুল ছাড়িয়া দিলে দেখিবে, ঢিলটি আবার স্বস্থানমুখে চলিল। যেখানে ধর না কেন, ছাড়িয়া দিলে আবার সেই স্থানেই যাইবে। কিন্তু একবার ঐরূপে সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার দেখ, আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না; তবে স্বস্থানকে মধ্যবর্তী করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ, রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মতো।

পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকে যাইতে চাহে ; তবে কে কবে তাহাকে পাশ দিয়া পূর্ব মুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে—পৃথিবীর নিকট যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটন-ই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকেও ঠিক সেইরূপ সেই নিয়মে আপনার নিকট আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানি-গাছে চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্যপথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ যেন পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারি-দিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার জো নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন—বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলা পদার্থ, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে ছোটো, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়ো, কলুর বদলের মতো সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে, তাহা আমরা জানি না। হয়তো ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে, আম নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপে পৃথিবীতে পড়ে, চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, আর পৃথিব্যাদি পদার্থও ঠিক সেই নিয়মে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য যাহার মধ্যস্থল, সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতের একটি সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতে সর্বত্র এক-ই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও উহার দিকে চলিতেছে, এ ইহাকে ঘুরিতেছে, ও উহাকে ঘুরিতেছে।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। গালিলিও কে ছিলেন ? তাঁহার দুইটি বড়ো কাজের কথা বলো।

২। লেখক কাহাকে গালিলিও 'অপেক্ষাও বড়লোক' বলিয়াছেন ? তাঁহা প্রধান কাজ কী ?

৩। 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' কী ?

৪। 'নিউটনের বাহাদুরি' কিসে ?

৫। পৃথিবী যে বলে ফলকে টানে, ফলও সেই বলে পৃথিবীকে টানে তাহা হইলে, 'পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন ? ফল-ই বা পৃথিবীর দিক যায় কেন ?'

৬। সৌরজগতের মূল নিয়মটা কী ?

৭। নিউটনের আবিষ্কারের ফলে আমরা এই পৃথিবীর সম্বন্ধে কী জানিতে পারিয়াছি ?

৮। 'চন্দ্রের অবস্থাও......রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মতো'—ব্যাপারটা বুঝাই দাও।

৯। ঢেলা যদি খুব জোরে ছুঁড়িলে পৃথিবীর যেখান হইতে ছোঁড়া হইয়াছে সেখানে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে চন্দ্রাভিযানে পৃথিবী হইতে মানুষের চন্দ্রে পৌছান সম্ভব হয় কিরূপে ?

১০। চন্দ্র পৃথিবীতে পড়িয়া যায় কেন ?

১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'পৃথিব্যাদি'।

১২। শব্দার্থ বল : 'প্রভূত', 'বৃক্ষচ্যুত', 'রজ্জুবদ্ধ', 'বেষ্টন'।

১৩। 'স্বয়ং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।'—'চারিদিকে' কোন কারক ?

১৪। 'বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে।'—এস্থলে 'বেগে' পদটি কি বিশেষ্য ?

['বেগ' শব্দটি বিশেষ্য হইলেও, এস্থলে 'বেগে' পদটি ক্রিয়া-বিশেষণ।]

১৫। এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে ক্রিয়া-পদের দুইটি কর্মের মধ্যে একটি সর্বনাম এবং তাহাতে বিভক্তি-চিহ্ন আছে, অন্যটি বিশেষ এবং তাহাতে বিভক্তি-চিহ্ন নাই।

['রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' বইয়ের "বড়ো খবর"—শীর্ষক রচনাটির মধ্যবর্তী অংশ এখানে "পাল আর দাঁড়" নাম দিয়া পরিবেষণ করা হইল।]

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চ'লছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্‌ঠক্ ক'রতে ক'রতে মাঝির বিচার-সভায় এসে উপস্থিত ; ব'ললে, 'এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে' পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেন না, আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারো হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হ'লেন বড়লোক। তুমি ঠিক ক'রে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটলোক হই, তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তাফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপি-চুপি ব'ললে, 'ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি ক'রে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ ক'রে, গুটিসুটি মেরে প'ড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়্‌ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ

নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।'

মাঝির ভয় হ'ল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বল'লে, 'পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবক্সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইৎরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি ক'রে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপ্‌ঝপানি থাক-না, কাজ না ক'রে উপায় নেই।'

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হ'য়ে দাঁড়াব, লাগাব ঝাপটা, চৌচির হ'য়ে যাবে পালের গুমর। ধরা প'ড়বে দাঁড়েই চলায় নৌকো—ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক।

['অহংকেরে'—অহংকারী। 'কদর'—মর্যাদা। 'ইয়ারবক্সি' (ফার্সী শব্দ)—সাথী, বন্ধুবান্ধব। 'গুমড়'—গর্ব, দেমাক।]

অনুশীলনী

১। এই গল্পকথার তাৎপর্য কী? পাল ও দাঁড় বলিতে কাদের বুঝায়?

২। ব্যাখ্যা কর : 'দাঁড়েই চালায় নৌকো'।

৩। 'কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।'—এই কথার অর্থ কী?

৪। 'নবাবি', 'বাবুয়ানা', 'ইৎরাম', 'অহংকেরে', 'ঝোড়ো' কোন্ শ্রেণীর পদ? 'কদর' ও 'গুমর' শব্দ দুইটির অর্থ কী?

৫। 'ঝগড়া চ'লছে পাল আর দাঁড়ে।'—এই বাক্যটির উদ্দেশ্য কোন্‌টি?

৬। এই রচনাটিতে কর্তৃকারকে '-এ' বিভক্তি-চিহ্নের প্রয়োগ দেখাও।
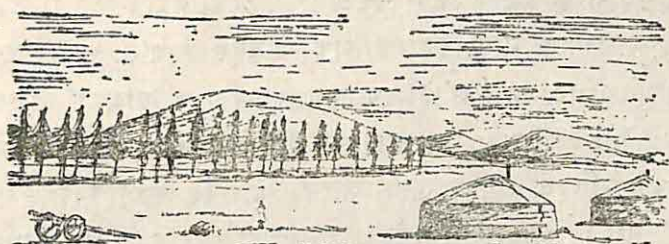
মোঙ্গোলিয়ার তৃণ-প্রান্তরে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মস্কো থেকে বিমান-যোগে ১৯৬০ সালের ১লা আগস্ট গভীর রাত্রে যাত্রা ক'রে, ২রা তারিখে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী Ulan Bator উলান্‌-বাতোর্‌-এ যখন আমরা পৌঁছোলুম, তখন বিকেল হ'য়েছে। সেই দিন সন্ধ্যায়, আর তার পরের দিন সকালবেলায়, কতকগুলি অবশ্য-কর্তব্য ব্যাপার চুকিয়ে নিই।

বেলা সাড়ে-এগারোটা আন্দাজ আমরা উলান্‌-বাতোর ত্যাগ করি। তখন আকাশে জ্বলন্ত সূর্য, হাওয়াও চ'লছিল বেশ। কারা-কোরুমের রাস্তা ধরে আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল। কারাকোরুম্‌ মোঙ্গোলিয়ার পুরানো রাজধানী, মোঙ্গোল ও তুর্কী সংস্কৃতির এক সুপ্রাচীন পীঠস্থান।

বইয়ে যেমন প'ড়েছি, এ হ'চ্ছে পুরোপুরি steppe বা step 'স্তেপ্‌' অঞ্চল, তৃণ-প্রান্তর বা ঘাসে-ঢাকা মাঠ। আমাদের সামনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর অ-চঞ্চল বিরাট সাগর-তরঙ্গের মতো প'ড়ে আছে। চতুর্দিকে নীচু-নীচু পাহাড় ; এই-সব পাহাড়ের ঢেউয়ের ভিতর দিয়েই আমাদের ক্রমাগত এগোতে হ'চ্ছিল। সমতলভূমি সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীন— কিন্তু সবুজ ঘাসে ভরা। সূর্যের তেজ ছিল বেশ, গরমই ব'লতে হবে, যদিও তখন বর্ষার সময়। যে দিকে ছ'চোখ যায়, শুধু নিরন্তর সবুজ। দিন আরো গড়িয়ে গেলে, সেই বিশাল প্রান্তরের ঘাসের শীষ ছুঁয়ে হাওয়া উঠ্‌ল হু-হু ক'রে, ঘাসের প্রাণ যেন জেগে উঠ্‌ল। ঘাসের ভিতর থেকে এক অদ্ভুত গন্ধ ছড়িয়ে প'ড়ছে। ঘাস যত

বাড়ে, তত বাড়ে এই গন্ধের তীব্রতা। মোঙ্গোলিয়ার তৃণ-প্রান্তরে ঘাসের সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকমের অন্য উদ্ভিদ্ও জন্মায় তার মধ্যে কতকগুলির পাতা আর ডাঁটা হয় সুগন্ধযুক্ত। যে হাজার হাজার ভেড়া এই তৃণ-প্রান্তরে চরে, তারা এই ঘাস আর তার সঙ্গে এই-সব সুগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ্ও খায়। এতে তাদের মাংসেও একটা বিশিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। ভেড়ার মাংস-ই এদেশের মুখ্য আহার।···মাঝে মাঝে হাওয়া অত্যন্ত জোরে বইছিল। এখানে রাস্তা ব'লতে প্রকৃত অর্থে কিছু-ই নেই, কেবল মাটির উপর প'ড়ে আছে পথের চিহ্ন। বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে আগে, পথ কোথাও জলে-ডোবা, কোথাও বা কাদা, তবে বেশির ভাগ মোটামুটি শুখ্‌নো এবং সহজ। প্রায়ই আবার খুব এবড়ো খেবড়ো, দু'দশ জায়গায় তো ভীষণ খাড়া—কেবল জীপ-ই এই-সব রাস্তার সঙ্গে ফয়সালা ক'রতে পারে। জীপে মোটের উপর স্বচ্ছন্দেই যাওয়া যায়, এটা ঠিক-ই ; তবে সময়ে-সময়ে হাড়-ভাঙা ঝাঁকুনিও খেয়েছি। অতএব পূরো যাত্রাটাকে খুব একটা আরামের বলি কী ক'রে। তৃণ-প্রান্তরের এই দেশে প্রাচীন কালে মোঙ্গোল, তুর্কী প্রভৃতি তাতার-জাতীয় লোকেরা শত শত সহস্র-সহস্র মাইল তাদের ছোটো-ছোটো ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ঘুরত—ঘোড়ায় চ'ড়ে তারা বিশ্ব-বিজয়ে নেমেছিল। আমরা এখন সেই 'স্তেপ'-প্রান্তর পূরো দিন ধ'রে জীপে ক'রে বিজয় করলুম।

সত্যই, এ আমার পক্ষে হ'ল এক নোতুন অভিজ্ঞতা, দৃশ্যের বিশালতার জন্যেই মুখ্যতঃ নোতুন। এ যেন ঘাসের সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়া। আর চারিধারে নীচু পাহাড়গুলির উপর দিগন্ত নেমে আস্‌ছে। যত দূর চোখ যায়, আমাদের সমতল বা ঢালু চড়াই-উতরাই পথের সামনে প'ড়ে আছে ছোটো-খাটো পাহাড় বা উঁচু জমি। দেখলেই মনে হয়, ওইখানেই বুঝি আমাদের সমতল পথের শেষ। কিন্তু সেখানে পৌঁছোলেই আবার পথের পুনরাবৃত্তি ; পাহাড়ের উপর থেকে আবার ঢালু পথ, আবার এক দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলের মধ্যে আমরা নেমে প'ড়লুম, এরও চতুর্দিকে আগের

মতো নীচু-নীচু পাহাড়। একটা সমতলভূমি ছাড়াতেই আবার এক সমতলভূমি। কখনো মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাচ্ছি, একটা জন-মানুষও চোখে পড়ে না। মাঝে-মাঝে আমরা ভেড়ার পাল দেখতে পাই—এক-একটা পালে ১০০ থেকে ৪০০-র মতো ভেড়া। গোরুর পালও দেখা যায়, আর দলবদ্ধ ঘোড়া, উট আর চমরীও চোখে পড়ে। সংখ্যায় অবশ্য ভেড়ার পালের মতো গোরু, চমরী ঘোড়া আর উটের পাল ততটা ভারী নয়, কখনো ৫০ কখনো বা ৮০-টার মতো এক একটা পালে। গোরুগুলি ইউরোপের গোরুর মতোই, পিঠে ককুদ্ নেই, ঘাড়ে লম্বা চুল। ঘোড়াগুলির চুল সুদীর্ঘ আর লেজও খুব লম্বা। ঘোড়া বলা চলে না, একটু বড়ো আকারের টাট্টু বলা যেতে পারে। মোঙ্গোলিয়ার ঘোড়ার জা'ত বিশ্ববিখ্যাত, সহনশীলতা, শক্তি আর গতিবেগের জন্যে শতাব্দী ধ'রে এদের সুনাম।

মোঙ্গোলিয়ার উট হ'ল মধ্য-এশিয়ার দু'কুঁজওয়ালা উট। ঈরান, আরব বা ভারতের এক কুঁজওয়ালা উটের থেকে এরা স্বতন্ত্র ধরনের। শীতের সময় ঠাণ্ডার তীব্রতা থেকে, আর মোঙ্গোলিয়ার বরফ-পড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে ওদের শরীরে খুব মোটা আর পুরু লোম গজিয়ে ওঠে। মধ্য-এশিয়াতে কাপড় ও দড়ি তৈরির জন্যে এই উটের লোম ব্যবহৃত হয়। এক কুঁজওয়ালা উটের মতো এই উট অত রোগা ও পাতলা নয়, অমন লম্বা ঠ্যাঙ-ও এদের নেই। এক-কুঁজ-ওয়ালা উটের তুলনায় মোঙ্গোলিয়ার দুই-কুঁজওয়ালা উট বিশালকায়, কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ। কী নরম এদের চোখের চাওনি! ভারতে ঈরানে বা আরবে যেমন শুষ্ক অঞ্চলের প্রাণী হিসেবে উটের ব্যবহার হয়, মোঙ্গোলিয়াতেও তেমনি। মোঙ্গোলিয়াতে মরুভূমি আছে, আবার শীতের সময়ে সারা দেশ বরফে ঢেকে যায়। এই দু'কুঁজওয়ালা উট বালির প্রচণ্ড তাপ আর বুক পর্যন্ত বরফ, দুই-ই অনায়াসে সহ্য ক'রতে পারে। মোঙ্গোল, তুর্কী বা মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য লোকে উটের দুই কুঁজের মাঝে ঝুলিয়ে দেয় বোঝা; আর 'স্তেপ' অঞ্চলে

ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে প্রায়ই দেখা যাবে, পিঠে বোঝা নিয়ে ধীর গতিতে সারিবদ্ধ-ভাবে চ'লে যাচ্ছে তিন চার বা দশটা উটের এক-একটা দল, তাদের সামনে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে একজন সওয়ার। মাটিতে বসিয়ে উটের পিঠে বোঝা চাপানো হয়, বা পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে নেওয়া হয়। উটের হাড় এখানে হাতির দাঁতের মতন ব্যবহার করা হয়, মেয়েদের গয়নাগাঁটি বা ছোটো ছোটো মূর্তি তৈরির কাজে।

এই-সব জন্তুর পালের পাশ দিয়ে যখন আমাদের জীপ যাচ্ছিল, আমাদের জীপের কাছে থেকে উটগুলোর পালানোর ধরন দেখে খুব মজা লাগছিল আমাদের। রোদের ঝাঁঝ বেশ ভালো লাগছিল, সূর্যদেব সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের চোখের সামনে ছিলেন না। মাঝে-মাঝে হাওয়া বইছিল অত্যন্ত জোরে ; সত্যই সুদীর্ঘ ঘাসের উপর দিয়ে হাওয়ার প্রবাহ, চোখ খুলে চেয়ে দেখ্‌বার মতো জিনিস। হাওয়া যেন কান ধ'রে মাটি অবধি টেনে নামাচ্ছে এই লম্বা ঘাসের সারিকে।

থেকে-থেকে একটো দু'টো নির্জন yurt 'য়ুর্ত্' দেখ্‌তে পাই। মোঙ্গোল নারী ও শিশু তার চারিধারে ব'সে আছে, ঘোরা-ফেরা ক'রছে। মোঙ্গোলীয় ভাষায় 'য়ুর্ত্'কে বলে ger 'গেল্', 'য়ুর্ত্' হ'চ্ছে রুষ আর ইউরোপীয় নামকরণ। এই 'য়ুর্ত্' হচ্ছে মোঙ্গোলিয়ার, যাকে বলা যেতে পারে, 'তাঁবু-বাড়ি'। এগুলোর কাঠামো কাঠের বা শক্ত গাছের ডালের, তার উপরে ভেড়ার লোমের মোটা felt ফেল্ট অর্থাৎ নাম্‌দা বা পশম-জমানো কম্বল দিয়ে ঢাকা। এর দরজা একটাই, আর কোনো জানালার বালাই নেই। 'য়ুর্ত্'-এর ভিতরের আগুন থেকে ওঠা ধোঁয়া বা'র হবার জন্যে বাড়ির মাথায় একটুখানি ফাঁক করা থাকে। বৃষ্টি বা তুষার-পাতের সময়ে, এই ফাঁক বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কখনো বা পাঁচ, আট বা দশটা 'য়ুর্ত্'-এর কোনো গ্রাম বা ছাউনির পাশ দিয়ে আমাদের জীপ চ'লে যাচ্ছিল। সাধারণতঃ এই অস্থায়ী তাঁবুর গ্রামগুলি কোনো ঝরনার ধারেই বসানো হয়। শাদা আর ঝরঝরে' এই-সব 'য়ুর্ত্' দূর থেকে

বড়ো সুন্দর দেখায়। কিন্তু এই-সব গাঁয়ের খুব কাছ দিয়ে আমরা যাই নি। কারণ গাঁয়ে আছে মোঙ্গোলিয়ার প্রকাণ্ড আর ভয়ংকর হিংস্র কুকুর ; Mastiff মাস্টিফ্-জাতের এই কালো কুকুরগুলি, কাছে গেলেই, চীৎকার ক'রে ওঠে, আর 'য়ুর্ত্'-এর চতুর্দিকে ছুটোছুটি শুরু করে। তবে আমাদের গাড়ির চলন-পথের খুব কাছে তারা আসে না। এই-সব 'য়ুর্ত্'-এর আশেপাশে আমরা দু'-চাকার গাড়ি দেখতে পাই, বলদে বা ঘোড়ায় এগুলিকে টানে। এই-সব 'য়ুর্ত্'-এর মেয়েদের ব'সে ব'সে কাজ ক'রতে বা ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে ; কেউ জ্বলন্ত উনুনে রান্না চাপাচ্ছে, কেউ বা পশম বুন্‌তে ব্যস্ত ; কেউ বা গোরু-ঘোড়ার দুধ দুইছে। বিচিত্র মোঙ্গোল পোষাক তাদের গায়ে, টুপি সকলেরই মাথায়, প্রায় সকলেই হাঁটু পর্যন্ত উঁচু জুতো প'রে ঘুরছে। ছেলেদের মধ্যে অবশ্য অনেককে খালি পায়ে দেখেছি। কিন্তু বাচ্চারা সকলেই স্বাস্থ্যে যেন ফেটে প'ড়ছে ; দেখে মনে হয়, বেশ শক্ত-সামর্থ, আর ভালোই খেতে পায়। রক্তে তাদের গাল টক্‌টক্ ক'রছে। সর্বত্রই 'কান-এঁটো করা' অর্থাৎ সুবিবৃত মুখের হাসির অভ্যর্থনা দিয়েছে লোকে, কখনো হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছে। মনে হ'চ্ছিল, এরা বেশ সুখেই আছে, আর নিজস্ব ধরনে সকলের উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। 'স্তেপ্' কী? উপরের ভ্রমণ-কথা পড়িয়া মোঙ্গোলিয়ার 'স্তেপ' অঞ্চলের বিষয়ে কী জানিতে পারিলে?

২। মোঙ্গোলিয়ার তৃণ-প্রান্তরে লেখকের ভ্রমণের বিবরণ নিজের কথায় লেখ।

৩। মোঙ্গোলিয়ার তৃণ-প্রান্তরে লেখক কোন্ কোন্ প্রাণী দেখিতে পান?

৪। মোঙ্গোলিয়ার ঘোড়া দেখিতে কিরূপ? তাহাদের কী জন্য সুনাম?

৫। ঘোড়ায় চড়িয়া কাহারা বিশ্ব-বিজয়ে নামিয়াছিল?

৬। অন্যান্য দেশের উটের তুলনায় মোঙ্গোলিয়ার উটের বৈশিষ্ট্য কী ?

৭। 'য়ুর্ত্‌' কী ? ইহা কী দিয়া এবং কী রূপে তৈরী হয় ?

৮। 'য়ুর্ত্‌'-এর আশেপাশে মেয়েদের কী কাজে ব্যস্ত দেখা যায় ?

৯। ব্যাখ্যা কর : (ক) 'হাওয়া যেন কান ধ'রে মাটি অবধি টেনে নামাচ্ছে এই লম্বা ঘাসের সারিকে।' (খ) 'আমাদের সামনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর অ-চঞ্চল বিরাট সাগর-তরঙ্গের মতো প'ড়ে আছে।'

১০। শব্দার্থ বল : 'পীঠস্থান', 'বৈচিত্র্যহীন', 'নিরন্তর', 'ককুদ্‌', 'সহন-শীলতা', 'স্বতন্ত্র', 'বিশালাকায়', 'সুবিবৃত'।

১১। ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে (ক) 'হাড়-ভাঙ্গা' শব্দ বিশেষণ রূপে, (খ) 'বরফ-পড়া' শব্দ বিশেষ্য রূপে ও (গ) 'ভালো' শব্দ ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহার কর।

১২। (ক) 'কী নরম এদের চোখের চাওনি !' (খ) 'তখন বর্ষার সময়।' (গ) 'একটা জন-মানুষও চোখে পড়ে না।'—এই বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় নির্দেশ কর।

১৩। কোনও উক্তিতে ক্রিয়া-পদ উপস্থিত না থাকিলেও যে তাহা বাক্য হইতে পারে, এই রচনাটি হইতে তাহার তিনটি উদাহরণ দাও।

১৪। 'ঘোড়ায় এগুলিকে টানে।'—বাক্যটিতে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে ?

১৫। এই রচনাটিতে কর্তৃকারক ও অধিকরণ কারকের একবচনে কোন্ কোন্ বিভক্তি-চিহ্ন দেখা যায় ?

হরিচরণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক রামদাস বাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ছেলেটি বড়ো ভালো। বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান্ চাকর, দুর্গাদাস বাবুর পিতার [রামদাস বাবুর] বড়ো স্নেহের ভৃত্য।

সব কাজ-কর্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গোরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখানো পর্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে বড়ো ভালোবাসে।

ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজ-কর্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে-মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, বলিতেন, "হরি, অন্য অন্য চাকর আছে ; তুই ছেলেমানুষ, এত খাটিস কেন ?" হরির দোষের মধ্যে ছিল, সে বড়ো হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, "মা আমরা গরিব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর ব'সে থেকেই বা কী হবে ?"

এইরূপ কাজ-কর্মে, সুখে, স্নেহের ক্রোড়ে হরিচরণের প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

ছেলে বি. এ. পাস করিয়া বাড়ি আসিয়াছে। মাতা ঠাকুরানী অতিশয় ব্যস্ত। ছেলেকে ভালো করিয়া খাওয়াইতে দাওয়াইতে, যত্ন আত্মীয়তা করিতে, যেন বাটীশুদ্ধ করিলেই একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এ ছেলেটি কে গা ?" মা বলিলেন, "এটি একজন কায়েতের ছেলে ; বাপ-মা নেই, তাই কর্তা

ওকে নিজে রেখেছেন। চাকরের কাজ-কর্ম সমস্তই করে, আর বড়ো শান্ত ; কোনো কথাতেই রাগ করে না। আহা! বাপ-মা নেই, তাতে ছেলেমানুষ, আমি বড়ো ভালবাসি।”

বাড়ি আসিয়া দুর্গাদাস বাবু হরিচরণের এই পরিচয় পাইলেন।

যাহা হউক, আজকাল হরিচরণের অনেক কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহে। ছোটো বাবুকে (দুর্গাদাসকে) স্নান করানো, দরকার-মতো জলের গাড়ু, ঠিক সময়ে পানের ডিবে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকা ইত্যাদি যোগাড় করিয়া রাখিতে হরিচরণ বেশ পটু। দুর্গাদাস বাবুও প্রায় জানেন, ছেলেটি বেশ intelligent স্নুতরাং কাপড়-কোঁচানো তামাক-সাজা প্রভৃতি কর্ম হরিচরণ না করিলে দুর্গাদাস বাবুর পছন্দ হয় না।

আজ দুর্গাদাস বাবুর একটা জাঁকাল ভোজের নিমন্ত্রণ আছে। বাড়িতে খাইবেন না, সম্ভবতঃ অনেক রাত্রে ফিরিবেন। এই সব কারণে হরির্চরণকে প্রাত্যহিক কর্ম সরিয়া রাখিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিচরণের মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। হরিচরণ বুঝিল, জ্বর আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রায়ই জ্বর হইত, স্নুতরাং এ-সব লক্ষণ তাহার বিশেষ জানা ছিল। হরিচরণ আর বসিতে পারিল না, ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটোবাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না, একথা আর মনে রহিল না। রাত্রে সকলেই আহারাদি করিল, কিন্তু হরিচরণ আসিল না। গৃহিণী দেখিতে আসিলেন। হরিচরণ ঘুমাইয়া আছে ; গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা বড়ো গরম। বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে ; স্নুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ভোজ শেষ করিয়া দুর্গাদাস বাবু বাড়ি আসিয়া দেখিলেন শয্যা প্রস্তুত হয় নাই। একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে আবার সমস্ত পথ কী করিয়া বাড়ি যাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবেন, আর হরিচরণ শ্রান্ত পদযুগলকে বিনামা হইতে বিমুক্ত করিয়া

অল্প অল্প টিপিয়া দিতে থাকিবে এবং সেই সুখে অল্প তন্দ্রার ঝোঁকে গুড়্গুড়ির নল মুখে লইয়া একেবারে প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন।

একেবারে হতাশ হইয়া বিষম জ্বলিয়া উঠিলেন, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-চারিবার 'হরিচরণ' হরি, হরে' ইত্যাদি রবে চিৎকার করিলেন। কিন্তু কোথায় হরি? সে জ্বরের প্রকোপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তখন দুর্গাদাস বাবু ভাবিলেন, বেটা ঘুমাইয়াছে। ঘরে গিয়া দেখিলেন, বেশ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরি ঢলিয়া বিছানার উপর পুনর্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাস বাবু হিতাহিতবিস্মৃত হইলেন। হরির পিঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম প্রহারে চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাস বাবু বলিলেন, "কচি খোকা ঘুমিয়ে প'ড়েছে, বিছানাটা কি আমি ক'রব?" কথায় কথায় রাগ আরও বাড়িয়া গেল; হস্তের বেত্র-যষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার দুই-তিন পড়িয়া গেল।

হরি রাত্রে যখন পদসেবা করিতেছিল, তখন এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় দুর্গাদাস বাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দুর্গাদাস বাবুর নিদ্রা হয় নাই। এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু হরিচরণকে বড়োই ভালো-বাসিতেন। তাহার নম্রতার জন্য সে দুর্গাদাস বাবুর কেন, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল।

রাত্রে কত বার দুর্গাদাস বাবুর মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসেন, কত লাগিয়াছে, কত ফুলিয়াছে। কিন্তু সে যে চাকর, তা তো ভালো দেখায় না। কত বার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন জ্বরটা কমিয়াছে কি না। কিন্তু তাহাতে যে লজ্জা বোধ হয়! সকাল বেলায় হরিচরণ মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল। দুর্গাদাস বাবু তখনও যদি বলিতেন, আহা!

বেলা নয়টার সময় কোথা হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তারের সংবাদে দুর্গাদাস বাবুর মনটা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিলেন, স্ত্রীর বড়ো পীড়া। ধড়াস করিয়া বুকখানা একহাত বসিয়া গেল। সেইদিনই তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিলেন, ভগবান? বুঝি বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

প্রায় মাস-খানেক হইয়া গিয়াছে দুর্গাদাস বাবুর মুখখানি আজ বড়ো প্রফুল্ল, তাঁহার স্ত্রী এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বাড়ি হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাস বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত। তলায় একস্থানে 'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত রহিয়াছে—বড়ো দুঃখের কথা, কাল সকাল বেলা দশ দিনের জ্বর-বিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।

আহা! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ! ধীরে ধীরে দুর্গাদাস বাবু পত্র-খানা শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

(সংক্ষেপিত)

['বিনামা'—জুতা। 'প্রাত্যহিক'—দৈনন্দিন, রোজকার। 'সংজ্ঞাহীন' —বেহুশ। 'সবুট পদাঘাত'—বুটজুতা সুদ্ধ পায়ের লাথি। 'শতধা ছিন্ন করিয়া'—শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া, টুকরা টুকরা করিয়া।]

অনুশীলনী

১। 'এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় দুর্গাদাস বাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।' এই বাক্যটির অর্থ কী? জল 'গরম' কেন?

২। এই গল্পটিতে কাহার কী পরিচয় পাইলে?

৩। শব্দার্থ বল : 'জঁাকাল', বিনামা', 'প্রাত্যহিক', 'সংজ্ঞাহীন' 'তন্দ্রা', 'হিতাহিতবিস্মৃত'।

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ

ভারতচন্দ্র রায়

ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
 ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
 বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
 বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
 বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
 যতগুলি ধুতুরার ফল।
থলিভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
 জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই পাব
 অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
 তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
 চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্বস্ব লয়
 নামমাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
 কী বা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
 চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কী করিব একা ঘরে র'য়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় ল'য়ে ॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কী করে গৃহিণীপনে খন খন ঝন ঝনে
আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই ॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ ॥

['কৃত্তিবাস'—শিব। 'বিভূতি'—ভস্ম। 'প্রমথ'—শিবের অনুচর। 'আছয়ে'—আছে। 'ঘোটনা'—যাহা দিয়া ঘোঁটা যায়। 'উজাড়িয়া'—উজাড় করিয়া। 'স্বতন্তরা'—স্বতন্ত্র (স্ত্রী)। 'আরোহিয়া'—আরোহণ করিয়া; চড়িয়া। 'গৃহিণীপনে'—গৃহিণীপনায়। 'খচমচ'—ঝঞ্ঝাট। 'নৈব'—'ন এব'; দুইটিই সংস্কৃত অব্যয় পদ। 'চ'-এবং, সংস্কৃত অব্যয়।]

অনুশীলনী

১। শিব ভিক্ষায় বাহির হইবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিলেন? গৌরী-ই বা তাহাতে কী করিলেন?

২। এই চিত্র হইতে বাঙ্গালী গরিব চাষীর সংসারের অবস্থা কী বুঝা যায়?

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ও শব্দার্থ বল: 'ক্ষুধানল', 'পঞ্চানন', 'অদ্যাবধি', 'দিগম্বর', 'নৈব'।

৪। এই কবিতাংশ হইতে বিভক্তিচিহ্ন-হীন কর্মকারকের উদাহরণ দাও।

৫। ব্যাখ্যা কর: 'সকলে নির্গুণ কর... রহিয়াছে সার'।

কামিনী রায়

আমার নমস্য

কৃষক অজ্ঞাত গ্রামে কর্ষে ভূমি তার
দেহে সহি খর রৌদ্র ধারা বরষার ;
সে যে খাটে, শস্য কাটে, তার মাঝখানে
কী গৌরব, জানি না সে জানে কী না জানে।
মূর্খ হোক্, দুঃখী হোক্, কহে সে ভিখারী,
সে আমার অন্নদাতা, নিত্য উপকারী।

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নির্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে বাটে, মোট বহি খায়,
কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার,
মাঝি মাল্লা, তাঁতি জোলা, সবাই আমার
নমস্য—সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হ'তে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনি না, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানা দিকে সকলের সনে।

['কর্ষে'—কর্ষণ করে ; চাষ করে। 'নির্মায়'—নির্মাণ করে। 'সনে'—সঙ্গে।]

অনুশীলনী

১। কাহারা নমস্য ? কেন তাহারা নমস্য ?
২। শেষ দুইটি পংক্তি ব্যাখ্যা কর।
৩। প্রথম ছত্রের উদ্দেশ্য ও বিধেয় নির্দেশ কর।
৪। 'দুঃখ হ'তে করে পরিত্রাণ।'—'দুঃখ হ'তে' কোন্ কারক ?
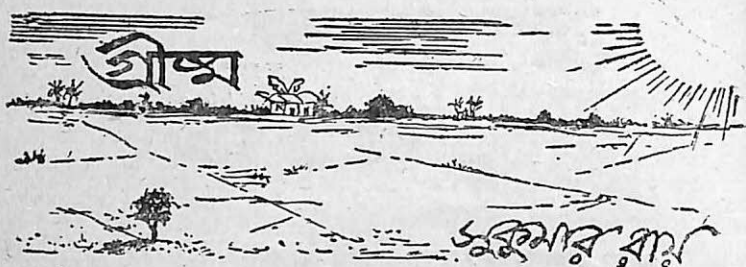
সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্র বেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন কাঁপিয়ে ভুবন মাতলো তপন নাচলো পবন,
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলে স্থলে।
ফেলছে আকাশ তপ্ত নিশাস, ছুটছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস,
ফুলের বিতান শুখনো শ্মশান, যায় বুঝি প্রাণ, হায় ভগবান্।
দারুণ তৃষায় ফিরছে সবায়, জল নাহি পায়, হায় কী উপায়!
তাপের চোটে কথা না ফোটে, হাঁপিয়ে ওঠে, ঘর্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড়, করে ধড়ফড় ধরার পাঁজর,
দশ দিক হয় ঘোর ধূলিময়, জাগে মহাভয় হেরি সে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বার বার ঘন হুংকার,
শুনি নিয়তই, থাকি থাকি ওই হাঁকে হৈ হৈ, মাভৈ মাভৈ॥

['নিশাস'—নিশ্বাস। 'বিতান'—বাগান। 'তৃষা'—তৃষ্ণা। 'সবায়'—সবাই]

অনুশীলনী

১। কবি গ্রীষ্মকে 'সর্বনেশে' কেন বলিয়াছেন?

২। 'জলে' 'অগ্নি জ্বলে'—ইহার অর্থ কী? গ্রীষ্মে 'ফুলের বিতান' শ্মশানের মতো দেখায় কেন?

৩। দ্বিতীয় ছত্রে 'আপন' পদটির পরিচয় কী?

৪। পঞ্চম ছত্রে কয়টি বিশেষ্য-পদ আছে এবং কোন্ পদটি বিশেষণ?

৫। গদ্যে প্রথম দুই ছত্রের কী রূপ দাঁড়াইবে?

কোথায় চ'লেছ তুমি গঙ্গে ?
শাল পিয়াল তাল
তমাল তরু রসাল
ব্রততী বল্লরী জটা—
সুলোল-ঝালর-ঘটা,—
ছায়া করি সুশীতল
ঢেকেছে তোমার জল
চ'লেছে অচলরাজি ধারানীর-অঙ্গে
কোথায় চ'লেছ তুমি গঙ্গে ?

কল-কল-কল স্বর
ধারা-জলে নিরন্তর—
বিশাল বিস্তৃত ধারা,
সমতল তৃণহারা
ধরণী চ'লেছে সঙ্গে
দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে
বট বেল নারিকেল
শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল,
অরণ্য নগর মাট,
গবাদি রাখাল মাঠ
প্রফুল্ল ক'রেছে কূল নীরধারা সঙ্গে—
কোথায় চ'লেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

বাণিজ্য বেসাতি পোত
ভাসায়ে চ'লেছে স্রোত,

তরী ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি' করি' খেলা
নাচায়ে চ'লেছ অঙ্গ—
ধবল তীর তরঙ্গ
ছুলিয়া ছুলিয়া সুখে
নর নারী গ্রীবা মুখে
ছড়ায়ে চিকুরজাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে ;
কোথায় চ'লেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

['ব্রততী'—লতা। 'বল্লরী'—লতা, মঞ্জরী। 'স্থলোল'—দোলায়মান। 'অচল'—পাহাড়। 'নীর'—জল। 'মাট'—মাটকোঠা, মাটির বাড়ি। 'পোত'—নৌকা, জাহাজ। 'গ্রীবা'—ঘাড়। 'চিকুর'—চুল।]

অনুশীলনী

১। গঙ্গার দুই তীরের দৃশ্য বর্ণনা কর।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'নিরন্তর', 'গবাদি'।

চন্দ্র-সূর্য-বন্দনা

রাজশেখর বসু

চাঁদের জয় হোক,
পরোপকারী ভদ্রলোক,
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে
যথাসাধ্য লণ্ঠনের কাজ করে রাতে ॥

সূয্যিকে নমস্কার,
এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার,
চোপর রাত দেখা নেই মোটে,
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে,
যখন তার কিছু দরকার নেই—
আরে, আলো তো ভর দিন থাকেই ॥

তবে লোক সূয্যিকে কেন চায় ?
কবিরা বলেন বটে—জ্যোৎস্নায়
ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয় তেন হয়,
কিন্তু কচি ছেলের কাঁথা কি চন্দ্রালোকে শুখয় ?
আমসত্ত্ব, ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম
এ সব শুখানো কি চাঁদের কম্ম ?
আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দুর,
ওর জন্য চাই কাঠফাটা কড়া রোদ্দুর।
সূর্য সৃষ্টির কারণই মশাই এই ;
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই ॥

অতএব গাও চাঁদের জয় সূয্যির জয়—
দুটোর একটাও ফেলবার নয় ।।

['ফাঁকিদার'—ফাঁকিবাজ। 'চোপর'—চৌপর, চতুঃপ্রহর, চার প্রহর। 'চৌপর রাত'—সারা রাত। 'মলয়'—দক্ষিণ-বাতাস। 'চম্ম'—চর্ম]

অনুশীলনী

১। প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেকেরই কার্যকরতা আছে—কিরূপে তাহা বুঝাইয়া বল।

২। চাঁদকে 'পরোপকারী ভদ্রলোক', বলিবার হেতু কী ?

৩। চন্দ্র ও সূর্য, কাহার কী কাজ ? তাহাতে মানুষের কী উপকার ?

৪। সূর্য আর চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও যে, 'বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই'।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'পরোপকারী', 'চন্দ্রালোক', 'যদ্দুর'।

৬। তৃতীয় স্তবকে 'শুখানো' কোন্ শ্রেণীর পদ ?

৭। 'কাঠফাটা' শব্দ দিয়া একটি বাক্য রচনা কর।

[কবির 'মেঘরাজ'-শীর্ষক কবিতার প্রথম কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছে।]

আমি শুনেছি সে কোন্ দেশে অজানা মাঠের শেষে,
অচেনা নদীটি মেশে সাগর-জলে ;
সেথা অনামা গিরির ছায় কাননের কিনারায়
বাস করে নিরালায় জেলের দলে।
তারা মাছ বেচে হাটে হাটে খেয়া দেয় ঘাটে ঘাটে
খেলা করে খোলা মাঠে গাঙের চরে ;
সুখে হাসিয়া কাটায় কাল নাই বড়ো গোলমাল
ভাবনার জঞ্জাল ভয় না করে।
তারা মিলে মিশে থাকে সুখে কথা কয় চোখে-মুখে,
রাগ হ'লে তাল ঠুকে লড়ায়ে মাতে ;
তবু কোনদিন কারো কাছে বিচার কভু না যাচে,
নিজের বিচার আছে নিজের হাতে।
তারা সভ্যতা শিক্ষার নাহি জানে ধিক্কার,
ভিক্ষার নাহি ধার ধারে কোনদিন,
শুধু চাষ করে জাল বোনে, খায় দায় আনমনে,
সাগরের গান শোনে স্বভাব-স্বাধীন।
সেথা ভীমু নামে ভারি জেলে, মোড়ল সে বহুকেলে'—
তাহারি লায়েক ছেলে মেঘরাজ নাম ;
ভারি জোয়ান পাথর-কাটা কসকসে' কালো গা-টা
নিটোল বুকের পাটা সুডোল সুঠাম।

ঝাড়া দীঘল সে সাত হাত নাই কোন দৃক্‌পাত,
ডিঙা ঠেলে দিনরাত গাঙের জলে।
বড়ো 'মক্ষুম' মার তার লক্ষ্যের কী বাহার ;
'টেঁটায়' হানে শিকার গহন-তলে।
সে যে শক্তির ভাণ্ডারী সাহসের গাণ্ডার-ই,
তুফানের কাণ্ডারী জোড়া নাই তার।
ভারি সাঁতারের সর্দার পাথারে 'খবরদার',
নৌকা-ই ঘর-দ্বার—এমনি ব্যাপার!
কত রাত-ভিত ঝড়-জল কিছুতে না চঞ্চল—
ডিঙিখানা টলমল চ'লেছে বেয়ে,
বড়ো একগুঁয়ে একরোখ ভয় করে সব লোক,
বুড়ো যুবা যেই হোক্ ছেলে কি মেয়ে।

['মক্ষুম'—মোক্ষম, নির্ঘাত। 'টেঁটা'—কোঁচ।]

অনুশীলনী

১। জেলেদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই কবিতাখণ্ড হইতে কী জানা যায় ?
২। জেলেরা কী কী উপায়ে মাছ ধরে, কিছু কি বলিতে পার ?
৩। মেঘরাজের চেহারার বর্ণনা কর।
৪। ব্যাখ্যা কর : 'তারা সভ্যতা শিক্ষার…ধারে কোনদিন'।
৫। 'নৌকা-ই ঘর-দ্বার—'—ইহা কি বাক্য ?
৬। 'জোড়া নাই তার।'—উদ্দেশ্য ও বিধেয় নির্দেশ কর।
৭। কবিতাটিতে 'বহুকেলে' ও 'পাথর-কাটা' শব্দ দুইটির অর্থ কি ?

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি-সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মতো তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ ;—
শুন ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে।

শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন !
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা জান না ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখি বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !"

নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে !
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি ;
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !

উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে !
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ॥

['রসাল'—আমগাছ। 'স্বর্ণলতিকা'—আলোকলতা 'ধনি'—(সম্বোধনে)—আদরের পাত্রী। 'নিন্দ'—নিন্দা কর। 'তেঁই'—তাই, সেইহেতু। 'কায়া'—শরীর। 'সৃজিলা'—সৃজন করিল, সৃষ্টি করিল। 'মলয়'—দক্ষিণ-বাতাস। 'তায়'—তাহাতে। 'মধুকর'—মৌমাছি। 'হিমাদ্রি-সদৃশ'—হিমালয়ের তুল্য। 'কালাগ্নি'—সর্বনাশা প্রলয়ের আগুন। 'তাপন'—তাপজনক; যে তাপ দেয়। 'লভয়ে'—লাভ করে। 'ভুঞ্জে'—ভোগ করে। 'শীতলিয়া'—শীতল করিয়া। 'হেথা'—এখানে। 'ললনে'—'ললনা' শব্দের সম্বোধনের রূপ; 'ললনা'-র অর্থ 'নারী'! 'বিধু'—চাঁদ। 'নীরবিলা'—নীরব হইল। 'স্বননে'—শব্দে। 'প্রভঞ্জন'—ঝড়। 'যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে' —পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, ও সহদেব; ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র। পাণ্ডুর পুত্রেরা 'পাণ্ডব' নামে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা 'কৌরব' নামে পরিচিত। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধের কথা আছে মহাভারতে। এই যুদ্ধে মধ্যম পাণ্ডব অর্থাৎ ভীম ভীষণ বিক্রমে কৌরব সৈন্যদের সংহার করেন। এস্থলে "ভীম" শব্দের অর্থ 'ভীষণ', এবং "ভীমসেন" পদে বুঝাইতেছে মধ্যম পাণ্ডব অর্থাৎ ভীমকে। 'রড়ে'—ছুটিয়া। 'ঐরাবত' —ইন্দ্রের হাতী। 'বধিলা'—বধ করিল। 'যোধপতি'—বড়ো যোদ্ধা]

অনুশীলনী

১। রসালের গর্ব কী কারণে? সে স্বর্ণলতিকাকে কেন বলে 'নিন্দ বিধাতায় তুমি'? 'বিধাতায়' পদটি কোন্ কারক?

২। কী 'কৌশলে' কবি এই কবিতাটিতে কী 'উপদেশ' দিলেন?

৩। ব্যাখ্যা কর :—(ক) 'যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।' (খ) 'ঐরাবত পিঠে চড়ি…কড় কড় কড়ে!" (গ) 'উরু ভাঙ্গি কুরুরাজ…যোধপতি'। (ঘ) 'ঊর্ধ্বশির… জনে!'

৪। গদ্যে রূপান্তরিত কর: 'শীতলিয়া মোর ডরে…আপনি পবন।' 'ডরে' পদে '-এ' বিভক্তি কী অর্থে?

৫। এই কবিতাটিতে কর্মকারকে '-রে', '-এ' ও '-য়' বিভক্তি-চিহ্নের প্রয়োগ দেখাও।

৬। শব্দার্থ লেখ : 'ক্ষুদ্র-কায়া', 'হিমাদ্রি-সদৃশ', 'বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী', 'যমদূতাকৃতি', 'সিংহনাদ'।

৭। 'হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে'—শেষ দুইটি পদ কোন্ কারক ?

৮। 'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে'—'উচ্চে' কোন্ শ্রেণীর পদ ?

৯। 'স্বামী' শব্দের বিপরীত স্ত্রী-বাচক শব্দ কী ?

১০ 'দরিদ্র', 'উর্ধ্ব', 'নিন্দা', 'দুখী', শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ কী ?

[দরিদ্র—ধনী। উর্ধ্ব—অধঃ। নিন্দা—প্রশংসা। দুখী—সুখী।]

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা হইতে কতিপয় স্তবক উদ্ধৃত করা হইল। ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দো-নৈপুণ্যের পরিচয় মিলিবে।]

ঘোর ঘোর সন্ধ্যায়
ঝাউ-গাছ দুলছে,
ঢোল কল্মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে,
লক লক শর-বন
বক তায় মগ্ন,
চুপচাপ চারিদিক—
সন্ধ্যার লগ্ন।
চারদিক নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপখান তিন-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে,
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝিঁর গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মানিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কানা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে।
চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা—
লাগছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হ'ল
কিংবা জোনাক হ'ল তারা।

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় শুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা রতন উঁছে।

বাঁশের ঝোপে জাগছে সাড়া,
কোল-কুঁজো বাঁশ হ'চ্ছে খাড়া,
জাগছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।

চ'লছে তরী চ'লছে তরী—
আর কত পথ? আর ক' ঘড়ি?
এই যে ভিড়াই। ওই যে বাড়ি,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে
দেখছো আলো? ঐ তো কুঠি,
ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজকে ছুটি।

ঝপ ঝপ তিনখান
দাঁড় জোর চ'লছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্ব'লছে।

গুরগুর মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক মাল্লার।

['ঝাঁঝি'—শেওলা বিশেষ। 'বীথি'—সারি। 'শেষের শিরে মানিক পারা'—'শেষ' অর্থাৎ বাসুকি নাগের ফনায় যেমন মানিক জ্বলে, অন্ধকার রাত্রির আকাশে তারাগুলিও যেন তেমনি মাণিকের মতো জ্বলিতেছে। 'তিমিরে'—অন্ধকারে। 'কেমন পারা'—কেমন যেন। 'আলা'—ক্লান্ত। 'উঁছে—উঁছিয়া লয়, খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লয়। 'চোখ যে আলা রতন উঁছে'—উপর আকাশে তারা আর চারিদিকে জোনাকি যেন উজ্জ্বল রত্ন, এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে চোখ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'কাঁড়ি'—স্তূপ, রাশি। 'মেঘ-মল্লার'—গানের একটি রাগের নাম। 'মাল্লা'– নৌকার মাঝি। 'হাল্লাক'—প্রাণান্ত।]

অনুশীলনী

১। কবিতাটির শেষ ছুটি স্তবক মুখস্থ লিখ।
২। 'নৌকো চলে আকাশ চিরে'—এরূপ মনে হইবার কারণ কী?
৩। 'চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা'—কেন?

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, 'কোথা হ'তে আগমন,
কী নাম ঠাকুর।'
বিপ্র কহে, 'কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জেলা বর্ধমানে—
এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, ক'রে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।
দন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
পুরিবে প্রার্থনা!

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো ছুটি পায় !
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।'

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
'কী আছে আমার !
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
'ঠিক বটে ঠিক।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে—
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, ছুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।'

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি,
লোহার মাছুলি ছুটি সোনা হ'য়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা-কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে!
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে—

তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে।' এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

['ভ্রমি—ভ্রমণ করিয়া। 'সহসা বিস্মৃতি ছুটে'—হঠাৎ মনে পড়ে।]

অনুশীলনী

১। কবি কোন্ জিনিসকে যথার্থ 'স্পর্শমণি' বলিয়াছেন ?

২। 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি'—এই পংক্তিটি কোন্ কবিতায় আছে ? কে এই কথা কী প্রসঙ্গে কাহাকে বলিয়াছেন ? 'ধনে' পদটিতে '-এ' বিভক্তি-চিহ্ন কেন ?

৩। ব্যাখ্যা কর : 'নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি গেল অস্তাচলে'।

৪। 'দিনান্তের ক্লান্ত রবি'—রবিকে কেন ক্লান্ত বলা হইয়াছে ?

৫। শেষ স্তবকের 'নদীনীরে' পদটি কোন্ কারক ?

৬। 'চিন্তিতের কানে কানে'—এস্থলে 'চিন্তিতের' কোন্ শ্রেণীর পদ ?

৭। মুখস্থ লিখ : 'শুনি কথা সনাতন……ছুঁতে নাহি ছুঁতে।'

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙীন ফুল।
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু'খান সরু ;
গা'খানি তা'র শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল।
বিজলী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।'
জনম কালো, বরণ কালো, কালো ভুবনময় ;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব ক'রেছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার,—
রঙ পেলে ভাই গ'ড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে,—নহে সোনার মুখ ;
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।

যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল-সুন্দী বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন !
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন ?
যদিও রূপা নয়কো রূপা-ই, রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী॥"

['শাঙন'—শ্রাবণ। 'কেতাব'—বই। 'রজ' (সংস্কৃত 'রজঃ')—ধুলো। 'তারি পদ-রজ লাগি'—কৃষ্ণের পদধূলির জন্য। 'জারির গান'—কারবালার যুদ্ধে যাঁহারা শহীদ হন, তাঁহাদের কথা লইয়া রচিত করুণ রসের গান; মহরমের সময়ে বাংলা দেশের গ্রাম অঞ্চলে এই গান গাওয়া হয়। 'শাল-সুন্দী বেত'—একজাতীয় বেত। 'পাগাল'—ইস্পাত।]

অনুশীলনী

১। 'রূপা'র রূপ ও শক্তি বর্ণনা কর।

২। কালো রঙে কি শ্রী আছে ? কী শ্রী আছে ?

৩। 'জারি গান' কাহাকে বলে ?

৪। ব্যাখ্যা কর : (ক) 'গা'খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।' (খ) 'কচি ধানের তুলতে চারা···হাসি।'

৫। শব্দের স্বর অনুনাসিক হইলে যে অর্থ বদলাইয়া যাইতে পারে, এই কবিতাটিতে তাহার কী উদাহরণ আছে ?

শীতের রাত্তিরে র‍্যাপার চোর

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আমাদের বাড়ি   চোর এসেছিল   কাল রাতে
সারা গায়ে তেল মাখা—
অঘ্রান মাস   কন্‌কনে শীত   রাত দুপুর
আকাশ কুয়াশা-ঢাকা ॥

ঘরের কিছুই   নেয়নিকো চোর   চুপিসাড়ে
খিড়কির দোর খুলে।
শুধু পিসিমার   গরম সবুজ   র‍্যাপারটা
সবে নিয়েছিল তুলে ॥

ভাঙা জানলাটা   ন'ড়ে উঠেছিল   খুট্‌ ক'রে
চারিদিক নিঃঝুম।
ভয় পেয়ে বুড়ী   পিসিমা চেঁচালো   ডাক ছেড়ে
ভেঙে গেল সব ঘুম ॥

তেল-মাখা গায়ে   ধরা প'ড়ে গেল   বেচারা চোর
তাকালো করুণ ভাবে।
ব'ললে, "ঘরেতে   রোগা ছেলেটার   ভীষণ জ্বর
কাঁপুনিতে ম'রে যাবে ॥

"ঘরে কিছু নেই   চাপা দেবো গায়ে   তাই ভেবে
ঠিক ছিল নাকো মাথা।

চাইলে তো কেউ দেবে না র্যাপার এই শীতে
মিছে জানি হাত পাতা ॥

"পুলিসের হাতে দিতে হয় যদি এখুনি দিন
ছেলেটা ম'রবে জানি।"
পিসিমার হু'টি পায়ে ধ'রে চোর কেঁদে বলে,
"মাপ করো ঠাকুরানি ॥"

পিসিমা ব'ললে, "র্যাপারটা নিয়ে এখুনি যা'
আগে বাঁচা ছেলেটাকে।"
বুড়ী পিসিমার ছু'চোখে গড়ায় শান্তি-জল
অঞ্চলে মুখ ঢাকে ॥

['র্যাপার'—চাদর, শাল।]

অনুশীলনী

১। চোরটি কেন র্যাপার চুরি করিয়াছিল ?
২। 'বুড়ী পিসিমার ছু'চোখে গড়ায় শান্তি-জল—কেন ?
৩। পিসিমা চোরটিকে ধরিয়া পুলিসে দিলেন না কেন ?
৪। 'ছু'চোখে গড়ায় শান্তি জল'—"ছু'চোখে" পদটি কোন্ কারক ?
["ছু'চোখে" (=ছু' চোখ হইতে)—অপাদান কারক।]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[কবির 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার চারিটি স্তবক "পুরানো কাগজ" নাম দিয়া এখানে পরিবেষণ করা হইল। খবরের-কাগজে দেশ-বিদেশের নানান খবর বাহির হয়—কোথায় কোন্ সমুদ্রে যাত্রি-বোঝাই জাহাজ ডুবিয়া বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কোথায় যুদ্ধ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছে এবং তাহাতে কত মানুষ নির্বিচারে নিহত হইতেছে, ইত্যাদি। খবরের-কাগজে বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন কল্যাণকর আবিষ্কারের খবরও প্রচারিত হয়। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান এবং পলাতক খুনী আসামীর হদিস পাইবার আশায়, খবরের-কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। দৈনিক কাগজে প্রতিদিনই এমনি নূতন নূতন খবর ও বিজ্ঞাপন বাহির হয়। দিন ফুরাইলে দিনের খবর বাসি হইয়া যায়, বাসি খবরে লোকের আগ্রহ থাকে না। দিন ফুরাইলে দৈনিক কাগজেরও আদর থাকে না। পুরানো কাগজ ঘরে জমিতে থাকে। একদিন ফেরিওলার কাছে পুরানো কাগজগুলি সের দরে বেচিয়া দিয়া ঘর মুক্ত করা হয়। 'আদর যাহার ফুরাল', তাহা মানুষ রক্ষা করে না, ফেলিয়া দেয়। ইহা-ই সংসারের নিয়ম।]

হাঁকে ফিরিওলা—কাগজ বিক্রি,
পুরানো কাগজ চাই!
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত
তাড়াগুলি হাতড়াই।
পুরানো কাগজ চাই;
বহুদিন ধ'রে জঞ্জাল বাড়ে
সের দরে বেচি তাই!
কেমন করিয়া একটি তাহার
হঠাৎ নজরে পড়ে;
দেখি সমুদ্রে যাত্রি-জাহাজ
কোথায় ডুবিল ঝড়ে।

হঠাৎ নজরে পড়ে,
আবার কোথায় মানুষের মাথা
বিকায় খুলির দরে।

নিরুদ্দেশ কে সন্তান লাগি
ঘোষিছে পুরস্কার ;
মৃত্যুঞ্জয় অমৃত কারা
করিছে আবিষ্কার।
ঘোষিছে পুরস্কার,
পলাতক খুনে লুকায়ে কোথায়
চাই যে হদিস তার।

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি,
পুরানো কাগজ চাই।
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল
জমাবার নাহি ঠাঁই।
পুরানো কাগজ চাই ;
আদর যাহার ফুরাল তাহারে
সের দরে বেচ ভাই।

['কোথায় মানুষের মাথা…খুলির দরে'—যুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় শত শত মানুষ নির্বিচারে নিহত হয় ; মড়ার মাথার খুলির কোনও দাম নেই, জ্যান্ত মানুষের মাথাও যেন তেমনি তুচ্ছ বস্তু, কাটিয়া ফেলিতে একটুও দ্বিধা হয় না। 'ঘোষিছে'—ঘোষণা করিতেছে। 'হদিস'—উদ্দেশ।]

অনুশীলনী

১। শেষ দুটি স্তবক মুখস্থ লিখ।
২। কবিতাটির অন্তর্নিহীত কোনও অর্থ আছে কি ?
৩। 'ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত'—'কোণেতে' পদে '-তে' বিভক্তি কেন ?

জ্যোতিষ-শাস্ত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি শুধু ব'লেছিলাম—
'কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা-চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধেকালে
তখন কি কেউ তারে
ধ'রে আনতে পারে।'
শুনে দাদা হেসে কেন
ব'ললে আমায়, খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
কেমন ক'রে ছুঁই।'
আমি বলি, 'দাদা, তুমি
জান না কিচ্ছুই।
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জানালার ফাঁকে
তখন তুমি ব'লবে কি, মা
অনেক দূরে থাকে।'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'
দাদা বলে, 'পাবি কোথায়
অত বড়ো ফাঁদ!'
আমি বলি, 'কেন দাদা,
ঐ তো ছোটো চাঁদ,
দুটি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধ'রে।'

শুনে দাদা হেসে কেন
ব'ললে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কত বড়ো।'
আমি বলি, 'কী তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়।
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড়ো কিছু।'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'

অনুশীলনী

১। খোকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রে চাঁদের কী রূপ জানিলে ?

২। খোকা চাঁদকে দেখে, আর খোকার দাদা চাঁদের কথা পড়ে—কাহার কথা ঠিক ?

৩। বুঝাইয়া দাও যে, খোকার দেখাও ভুল নয়, খোকার দাদা ইস্কুলে যাহা পড়ে তাহাও মিথ্যা নয়।

৪। কবিতাটির শেষ দশ লাইন মুখস্থ লিখ।

অগ্র-পথিক

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচীর তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির !
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি-চপল ।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত
গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত ।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান্,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান্
চলমান-বেগে প্রাণ উছল ।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

নেমেছে কি রাতি ? ফুরায় না পথ সুদুর্গম ?
কে থামিস পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম ?
ব'সে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দু'দিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই !
মোদের লক্ষ্য চির-অটল !
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল,
বাঁধ রে বুক, চল্ রে চল্ ॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয় সুসংবাদ।
ওরে ত্বরা কর! ছুটে চল্ আগে—আরো আগে।
গান গেয়ে চল্ অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল্ তারো পুরোভাগে
তোর অধিকার কর দখল!
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল।
জোর কদম চল্ রে চল্॥

['প্রাচীর'—প্রাচ্যের, পূর্বদেশের। 'মরু-সঞ্চর'—যাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। 'অগ্র-পথিক'—অগ্রগামী, যাহারা আগে আগে চলিয়াছে। 'পাঁওদল'—পদাতিক দল। 'গিরি-গুহা'—পর্বতের গুহা। 'সৃজিব'—সৃষ্টি করিব। 'শ্রম-মহান্'—আমরা আমাদের শ্রমের দ্বারা এক মহান নব জগৎ গড়িয়া তুলিব। 'পথ-মঞ্জিল'—সরাই, পান্থনিবাস। 'ভগ্নোৎসাহ—যাহার উৎসাহ ভগ্ন হইয়াছে, যে মুষড়িয়া পড়িয়াছে। 'নিরুদ্যম'—যাহার উদ্যম নাই। 'ব্রতী'—যাহারা কোনও ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। 'অগ্র-নায়ক'—আগুয়ান নেতা।]

অনুশীলনী

১। অগ্র-পথিক কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক মুখস্থ লিখ।

২। কবি কাহাদের 'অগ্র-পথিক' বলিয়াছেন?

৩। এই কবিতাটিতে কবির লক্ষ্য কাহারা? কী উপলক্ষ্যে কাহারা এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে পারে?

৪। কবিতাটি যে যুবকদের উদ্দেশে রচিত, তাহার প্রমাণ কী?

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 'ভগ্নোৎসাহ', 'নিরুদ্দম', 'পুরোভাগ'।

রজনীকান্ত সেন

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ !
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী
অতুল বিপুল গিরি অলঙ্ঘ্য।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি
চুম্বে চরণতল নিরবধি,
মধ্যে পূত জাহ্নবী-জল-
ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র সঙ্ঘ।

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে কোটি
তটিনী মত্ত খর-তরঙ্গ।
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভার-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ ॥

['অভ্র'—মেঘ ; আকাশ। 'অভ্রভেদী'—যাহা মেঘ বা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ অত্যুচ্চ। 'অলঙ্ঘ্য'—যাহা লঙ্ঘন অর্থাৎ অতিক্রম করা যায় না। 'উত্তরে ঐ অভ্রভেদী…গিরি অলঙ্ঘ্য'-বাংলা তথা ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত, ইহার শৃঙ্গ মেঘের উপরে উঠিয়া গিয়াছে ; এই সমুন্নত পর্বত অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। 'জলধি'—সমুদ্র। 'চুম্বে'—চুম্বন করে। 'নিরবধি'—সর্বদা। 'দক্ষিণে… নিরবধি'—বাংলা তথা ভারতের দক্ষিণে ভারত সমুদ্র। 'পূত'—

পবিত্র। 'জাহ্নবী'—গঙ্গা নদীর আর এক নাম। 'শ্যাম-ক্ষেত্র—সজ্য'—শ্যামল মাঠ সকল। 'ফুল-পরিমল'—ফুলের সুগন্ধ। 'সিঞ্চে'—সিঞ্চন করে, সেচন করে। 'তটিনী'—নদী। 'খর-তরঙ্গ'—বাংলার নদনদী প্রবল ঢেউ তুলিয়া তীব্র স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'মধুপ'—মৌমাছি। 'গুঞ্জে'—গুনগুন করে। 'নব কিশলয়'—নবপল্লব, কচি পাতা। 'পুঞ্জ'—রাশি, সমূহ। 'শাখি-বৃন্দে'—বৃক্ষ-সমূহে ; শাখা অর্থাৎ ডাল যাহার আছে, সে 'শাখী' অর্থাৎ গাছ। 'ফল-ভার-নত…অঙ্গ'—বঙ্গ-ভূমিতে গাছের সমারোহে, ফলের ভারে গাছগুলির ডাল নুইয়া পড়িয়াছে।]

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। বাংলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণনা কর।
৩। 'সিঞ্চে', 'গুঞ্জে' কোন্ শ্রেণীর পদ ?
৪। তৃতীয় পংক্তির 'গিরি' পদের বিশেষণ কী কী ?